মার্কস ও মার্কসবাদীদের অজ্ঞতা

ডক্টর রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী



রাশিয়ার রাজপরিবার জার নিকোলাস, (বাঁয়ে) রানী আলেকজান্দ্রা, চার মেয়ে (বাঁ দিকে থেকে) মেরী, তাতিয়ানা, ওল্‌গা ও অ্যানাস্তাসিয়া এবং ছেলে আলেক্সি। এমন ভাবে সাজিয়ে তাদের গুলি করে মারা হয়।

বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা

মার্কস ও মার্কসবাদীদের অজ্ঞতা

ডক্টর রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী

বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র
৬,বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক ঃ
অরুণ ঘোষ
সেভ ইন্ডিয়া মিশন
বি ই — ৩০০, সল্টলেক
কলকাতা— ৭০০০৩৪
ফোন : ২৩৩৭১৯০৭

প্রথম প্রকাশ ঃ আষাঢ়, ১৪০৬
দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ ঃ মাঘ, ১৪০৮ (৬ ডিসেম্বর, ২০০১)
তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ ঃ আশ্বিন, ১৪১৭, নভেম্বর, ২০১০
চতুর্থ সংস্করণ : ফাল্গুন, ১৪২৪ (১লা মার্চ, ২০১৮)

মূল্য ঃ তিরিশ (৩০) টাকা মাত্র

বর্ণসংস্থাপন ঃ
দীপ কম্পিউটার সেন্টার
২৭ কানাই ধর লেন
কলকাতা - ১২

মুদ্রণে ঃ
ঘোষ অপসেট
২৬/২ মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সরণী
কলকাতা - ৭০০ ০৫৪

লেখকের কথা

আজ ১৯৯৯ সালের ১২ই জুলাই এই "লেখকের কথা" লিখতে বসেছি। এর ঠিক দু'দিন আগে, ১০ই জুলাই, কলকাতার মাটিতে এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটে গেছে। গত ১১ই জুলাই তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকার খবর অনুসারে ঐ দিন বিকাল বেলা শিয়ালদহ স্টেশন চত্বরে কমিউনিস্ট লীগ, সেন্টার ফর দি কমিউনিস্ট রিভলিউশনারিজ ও মার্কসবাদী অধ্যয়ন কেন্দ্র নামে তিনটি মার্কসবাদী সংস্থা "যুদ্ধ-বিরোধী সভা"র আয়োজন করে। সভার নেতারা যে বক্তব্য রাখছিল তার সার কথা হল, বর্তমানে কারগিলে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ও মুসলীম সন্ত্রাসবাদী জঙ্গিদের সঙ্গে ভারতীয় জওয়ানদের যে যুদ্ধ চলছে তা একটা সাজানো ব্যাপার মাত্র। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীঅটল বিহারী বাজপেয়ী ও পাকিস্তানী প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফের এক গোপন শলা-পরামর্শের ফল হল এই যুদ্ধ।

তারা আরও বলতে থাকে যে, কাশ্মীরে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ বলে তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়া উচিত। কাশ্মীর পাকিস্তানেরই প্রাপ্য, তাই ভারত সরকারের উচিত কাশ্মীরকে পাকিস্তানের হাতে তুলে দেওয়া। তারা আরও বলতে থাকে যে কাশ্মীরকে ধরে রাখতে যে কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে তা নিছক অপচয় মাত্র। এই টাকা গরিবের ডাল-রুটি যোগান দেওয়ার জন্য খরচ করা উচিত। কাগজের রিপোর্ট অনুযায়ী বেলা ৪টা নাগাদ এক মহিলা নেত্রীর ভাষণ শুনে জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। জনতার মধ্যে অনেকে চিৎকার করতে থাকে যে, এরা আই এস আই-এর চর। বেগতিক দেখে সংগঠনগুলির কর্মী ও নেতারা পালাতে থাকে এবং জনতা পিছু-ধাওয়া করে তাদের ধরে ফেলে ও বেদম মারধোর করে। মহিলাকর্মীরাও রেহাই পায় না। এর আগে গত ৩রা জুলাই হাজরা পার্কে তারা অনুরূপ একটা সভা করে এবং বলে যে, অটল বিহারী বাজপেয়ী ও নওয়াজ শরীফ রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্যই এই যুদ্ধ লাগিয়েছে। নওয়াজ শরীফের উদ্দেশ্য হল পাকিস্তানে ভারত-বিরোধী জিগীর তুলে তার নড়বড়ে আসন শক্ত করা এবং শ্রীবাজপেয়ীর উদ্দেশ্য হল, আগামী ১৩-তম লোকসভা নির্বাচনে সাধারণ মানুষের সমর্থন ও ভোট আদায় করা। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, ১৯৪৭ সালে এই মার্কসবাদীরা একই কায়দায় মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে সমর্থন করে এবং পাকিস্তান সৃষ্টিতে মদত যোগায়।

যাই হোক, ১০ই জুলাইয়ের উপরিউক্ত ঘটনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তা একটি অতিশয় মঙ্গলকর দিকের ইঙ্গিত দেয়। গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, দেশের জনসাধারণ কমিউনিস্টদের দেশদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরী চরিত্র ধরে ফেলেছে। আর মঙ্গলকর কারণ এর দ্বারা স্পষ্ট হচ্ছে যে, বর্তমানে আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে এক অভূতপূর্ব জাতীয়তাবাদী চেতনা ও দেশপ্রেম জাগ্রত হয়েছে এবং এই দেশাত্মবোধ ও জাতীয় জাগরণই ভারতবর্ষকে বিশ্বের দরবারে সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করবে। আর এটাও দিনের আলোর মতই পরিষ্কার যে, উদ্দেশ্যহীন ও দুর্নীতিবাজ কংগ্রেস সরকার বিগত ৫০ বছরে যা পারেনি, বর্তমান জাতীয়তাবাদী সরকার মাত্র ১৩ মাসের রাজত্বকালের মধ্যে তা পেরেছে। দেশের মানুষকে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছে তাদের মনে স্বাভিমান জাগ্রত করতে পেরেছে।

এই দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী সরকার যখন গত ১৯৯৮ সালের ১১ই মে পোখরানে সফল পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা করে তখন তাতে ভারতের প্রতিটি দেশভক্ত নাগরিকই গর্ব অনুভব করে। বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের মনেও এই ঘটনা গরিমা ও দেশপ্রেমের এক জোয়ার এনে দেয়। এই কারণেই ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক তাদের জন্য যে বিশেষ বন্ড চালু করে

তা কয়েক দিনের মধ্যেই বিক্রি হয়ে যায়। কিন্তু দেশের এই বিশ্বাসঘাতক কমিউনিস্টদের দল ঐ সাফল্যের ঘটনাকে নানাভাবে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতে থাকে। কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় তারা হোর্ডিং দেয়, "পারমাণবিক না অমানবিক?" কিন্তু শুধু দেশের লোকই নয়, বিদেশের ভারতীয়রাও তাদের এই ঘৃণ্য প্রচারের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানায়। এই কারণেই, ঐ ঘটনার কিছুদিন পর আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা জবরদস্ত কমিউনিস্ট নেতা শ্রীজ্যোতি বসু লন্ডনের ভারতীয়দের এক সভায় যখন পোখরানের ঘটনাকে নিন্দা করে ভাষণ দিতে শুরু করেন, তখন শ্রোতারা হৈ-হল্লা করে ও হাততালি দিয়ে সেই মির্জাফরি বক্তৃতা মাঝপথে বন্ধ করে দেয়। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল, ভারত পারমাণবিক পরীক্ষা চালালে এদের কাছে তা অমানবিক, কিন্তু সেই একই পরীক্ষা চীন করলে তা সম্পূর্ণ মানবিক। ভারত পোখরানে মাত্র ৫টি পরীক্ষা চালিয়েছে, কিন্তু চীন পরীক্ষা করেছে ৪৫টি বোমা ও সোভিয়েট রাশিয়া পরীক্ষা করেছে ৭১৫টি বোমা এবং তখন তারা নীরব থেকে প্রচ্ছন্নভাবে তাকে সমর্থন করেছে।

ঠিক একইভাবে, ভারতের বিজ্ঞানীরা যখন সফল মিসাইল উৎক্ষেপণ করেন তখন এই কমিউনিস্টরা তাকে ব্যঙ্গ ও উপহাস করে এবং বলে যে, ভারত যুদ্ধবাজ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু একই পরীক্ষা যখন চীন করে তখন নীরবে তাকে সমর্থন ও প্রশংসা করে। তাই এই সব ঘটনা থেকে দেশের লোকের বুঝতে বাকি নেই যে বিশ্বাসঘাতকতা, দেশদ্রোহিতা ও মিথ্যা ভাষণের ক্ষেত্রে এই মার্কসবাদীরা সকলের অগ্রগণ্য। সম্প্রতি এই কমিউনিস্ট নেতারা এই মিথ্যা কথা বলে চলেছে যে, বর্তমানে ভারত এক আর্থিক সঙ্কটের মধ্য দিয়ে চলেছে এবং কারগিলের যুদ্ধই এই আর্থিক সঙ্কটের কারণ। অথচ প্রকৃত তথ্য বলছে যে, দ্রব্যমূল্যের বর্তমান বৃদ্ধির হার সব থেকে কম। খাদ্যশস্যের উৎপাদন ২০০ কোটি টনের লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে গেছে এবং তা সংরক্ষণ করার জন্য গুদামঘরের অভাব দেখা দিয়েছে। বিদেশী মুদ্রার ভাণ্ডার আছে প্রায় ২০০০ কোটি ডলার এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের তেজীভাব এত বেশি যে শেয়ার বাজারের সূচকাঙ্ক সর্বকালের রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। এর কোনোটাই অর্থনৈতিক সঙ্কট সূচিত করে না।

দেশপ্রেম, দেশভক্তি, দেশাত্মবোধ ইত্যাদি শব্দগুলি মার্কসবাদী শাস্ত্রে অনুপস্থিত। তাই দেশমাতৃকার অঙ্গচ্ছেদ তাদের মনে বেদনার সৃষ্টি করে না এবং বলতে পারে "পাকিস্তানের দাবি মানতে হবে, তবেই ভারত স্বাধীন হবে।" বলতে পারে, তিনবিঘা বাংলাদেশকে দিয়ে দাও। আজাদ কাশ্মীর তো বটেই, পুরো কাশ্মীরটাই পাকিস্তানকে দিয়ে দাও। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার হল, দেশকে টুকরো টুকরো করে ফেলাই যাদের নীতি, সেই মার্কসবাদীরাই আওয়াজ তুলছে, "বি জে পি হটাও, দেশ বাঁচাও"। কিন্তু সুখের কথা হল এই যে, বাংলার মানুষ আজ বুঝে ফেলেছে যে, দেশকে বাঁচাতে হলে কাদের হঠানো দরকার। ১০ই জুলাইয়ের ঘটনা সেটাই প্রমাণ করে।

মার্কসবাদীদের ভ্রান্ত নীতি আজ তাদের এমন জায়গায় নিয়ে গেছে যে, মুলায়ম সিং বা শারদ পাওয়ারের মত লোকও যে বিদেশিনী মহিলাকে পরিত্যাগ করেছে, আমাদের মাননীয় জ্যোতিবাবুর দল সেই মহিলাকে ভজনা করে চলেছেন। যেই কংগ্রেস দলকে বিগত লোকসভা নির্বাচনের সময়ও তারা যথেচ্ছ গালাগালি করেছেন, আজ ক্ষমতার লোভেই হোক আর অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদেই হোক, সেই কংগ্রেস ও সোনিয়া গান্ধীর কাছে তাঁরা আত্মসমর্পণ করেছেন। কিন্তু ডুবন্ত নৌকার নিয়ম একটাই—সে নিজেও ডোবে এবং যারা তাতে আরোহী হয় তারাও ডোবে।

রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী

২৭শে আষাঢ়, ১৪০৬ সন

৪৪/১, সাউথ রোড, কলকাতা-৭৫

সূচীপত্র

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

"মার্কস ও মার্কসবাদীদের অজ্ঞতা" বইখানির প্রথম সংস্করণ বেশ কিছুদিন হলো নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছে।

চাহিদার তাগিদ দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশনের দাবি নিয়ে এগিয়ে আসে। কিন্তু হুবহু পুনর্মুদ্রণ সম্ভব হয়ে ওঠেনি বইটিকে আরও সমৃদ্ধপুষ্ট করে তোলার প্রয়োজনে। সমৃদ্ধির উপকরণ হিসাবে অল্প বিস্তর তথ্যের অবতারণার পরিপ্রেক্ষিতে লেখক তাঁর মন্তব্য প্রতিষ্ঠায় অধিকতর মূল্য আরোপ করেছেন বর্তমান সংস্করণে। কাজটি সমাধা করতে সময় লাগলো। সেজন্য আমরা সহৃদয় পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী।

১লা ডিসেম্বর, ২০০১ প্রকাশিকা

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

সকলেরই জানা আছে যে, ইসলাম একটি ঘৃণার তত্ত্ব। ইসলাম সমগ্র মানব সমাজকে দু-ভাগে ভাগ করে। যারা আল্লার কোরান ও আল্লার নবী মহম্মদে বিশ্বাস করে তারা হল সাচ্চা মুসলমান বা মোমেন। আর যারা তা করে না, তারা হল ঘৃণীত কাফের। কোরান মতে, এই কাফেররা হল ঈশ্বরহীন পশু। তাই তাদের ওপর যে কোন রকমের অত্যাচার করা চলে। ইসলামের মত মার্কসবাদও একটি ঘৃণার তত্ত্ব এবং এই তত্ত্বও মানুষকে দু-ভাগে ভাগ করে। যারা মার্কসবাদী তত্ত্বে বিশ্বাস করে, তারা হল কমিউনিস্ট, আর যারা তা করে না, তারা হল ঘৃণীত শ্রেণী-শত্রু। এরা সমাজবাদের শত্রু তাই এদের হত্যা করা বা এদের ওপরও যে কোন রকমের অত্যাচার করা চলে। লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে তুং থেকে দেং জিয়াও পিং বা পলপটের মত কমিউনিস্ট লক্ষ লক্ষ নেতারা শ্রেণী-শত্রু হত্যা করেছেন। বিগত ১৯৮৯ সালে চীনের কমিউনিস্ট সরকার নিরীহ চীনা ছাত্রদের ওপর যে আক্রমণ চালায় তার তুলনা কোথাও পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। প্রায় এক লক্ষ অবস্থানরত ছাত্রদের ওপর ট্যাঙ্ক ও মেশিনগান দিয়ে হামলা করা হয়। কত ছাত্র সেদিন মারা গিয়েছিল আজও চীনা সরকার তা জানায়নি।

তবে সুখের কথা হল, মার্কসবাদ নামক ঘৃণার তত্ত্ব অবলুপ্তির পথে। সমগ্র পৃথিবীতে একটি মাত্র দেশে আজ প্রকৃত মার্কসবাদ টিকে আছে, আর সেই দেশটির নাম হল উত্তর কোরিয়া। সেখানে কি অবস্থা? উত্তর কোরিয়ার সরকার সমস্ত দেশবাসীকে তিন ভাগে ভাগ করেছে এবং এরা হল (১) টম্যাটো, (২) আপেল এবং (৩) আঙুর। টম্যাটোরা হল সাচ্চা কমিউনিস্ট। তাই টম্যাটোর মত তাদের বাইরেটাও লাল, ভিতরটাও লাল। আপেলরা হল ভণ্ড কমিউনিস্ট। তাই তাদের বাইরেটাই শুধু লাল। আর আঙুররা হল সবথেকে ঘৃণ্য। তাদের ভিতরে বা বাইরে, কোথাও লাল নেই। এই ভারতবর্ষে এক সময় পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা ও ত্রিপুরা, এই তিন রাজ্যেই কমিউনিস্টদের প্রভাব ছিল। আজ এই তিন রাজ্য থেকেও মার্কসবাদ অবলুপ্ত হতে চলেছে।

৫ নভেম্বর, ২০১০ ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী

মার্কস ও মার্কসবাদীদের অজ্ঞতা ঃ

গত ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বরের অযোধ্যার ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে সারা দেশ জুড়ে যে অভূতপূর্ব হিন্দু জাগরণ শুরু হয়েছে, আমাদের বামপন্থী নেতৃবৃন্দ তার মূল সুরটি অনুধাবন করতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁরা একে একটি মামুলি ও ক্ষণস্থায়ী ধর্মীয় জিগীর হিসাবে ধরে নিয়ে সর্বশক্তি দিয়ে এর বিরোধিতায় নেমে পড়েছেন। যদিও তাঁরা ভাবছেন যে নিষ্ঠাবান মার্কসবাদীর কাজই তাঁরা করছেন, কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে, যে পথ তাঁরা বেছে নিয়েছেন তা চূড়ান্তভাবে অ-মার্কসবাদী, ভ্রান্ত ও আত্মঘাতী।

যে ভুলটি তাঁরা অতীতেও করেছেন এবং আজও করে চলেছেন তা হল, হিন্দুত্বই যে ভারতের জাতীয়তাবাদ এই ধ্রুব সত্যটিকে তাঁরা স্বীকার করতে নারাজ। কারণ কি? কারণ হল এই যে মার্কস সাহেব অনেক মূল্যবান গ্রন্থ লিখে গেছেন ঠিকই, তাঁর কোনো গ্রন্থেই তিনি এই কথা লিখে যাননি যে, 'হিন্দুত্বই ভারতের জাতীয়তাবাদ'। শুধু ঋষি অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ বা স্বামী বিবেকানন্দের মত ভারতীয় মনীষীরাই এই কথা বলে গেছেন। কিন্তু ভারতীয় মনীষীদের এই সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল কথাবার্তা শোনার তাঁদের প্রয়োজনই বা কি আর সময়ই বা কোথায়? তাঁদের মতে মার্কস নামে জার্মানীতে এক ভদ্রলোক জন্মেছিলেন এবং শুধু তাঁরই মস্তিষ্কে কিছু বুদ্ধিসুদ্ধি ছিল। অথবা লেনিন নামে রাশিয়ায় এক ভদ্রলোক জন্মেছিলেন শুধু তাঁর খুলিতেই ঘিলু নামক পদার্থ ছিল। এছাড়া বাদবাকী সবাই হল মূর্খস্য মূর্খ। কাজেই এই সব মূর্খরা কি বলেছে না বলেছে তাতে কিই বা আসে যায়? আর তাঁরা যে সব বইপত্র লিখে রেখে গেছেন তা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিলেই বা কি ক্ষতিবৃদ্ধি হয়?

এদের ক্ষুদ্র জ্ঞান ও ক্ষুদ্র বুদ্ধি বলে যে, যা ধর্ম তাই রিলিজিয়ান এবং যেহেতু বুদ্ধিমান মার্কস রিলিজিয়নকে আফিম বলে গেছেন, তাই ইসলাম বা খ্রিস্ট ধর্মের মত হিন্দুধর্মও আফিম এবং পরিত্যাজ্য। এই বিশ্বে একমাত্র মার্কস সাহেবের বাণীই অভ্রান্ত সত্য, তাকে অতিক্রম করবে কে? তাই যে হিন্দুধর্ম ও হিন্দু দর্শনকে না জানলে ভারতবর্ষকে জানা যায় না, ভারতবর্ষকে বোঝা যায় না, মার্কসবাদের দ্বারা বিকৃতবুদ্ধি সেই সব মার্কসবাদীরা হিন্দুধর্মকে জানার কোনো আন্তরিক চেষ্টা তো করলই না, বরং আফিমের মতই পরিত্যাগ করল। একমাত্র মার্কসীয় কেতাবেই সর্বশক্তিমান এবং সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক সত্য আছে। তাই অন্য কেতাবে কি প্রয়োজন?

কাজেই এই বিশাল ও সুপ্রাচীন দেশ সম্বন্ধে স্বল্পবুদ্ধি কূপমণ্ডুক মার্কসবাদীদের জ্ঞান বাহ্যিক স্তরেই পড়ে থাকল। ভারতবর্ষ বলতে তাঁরা বোঝেন খানিকটা ভৌগোলিক সীমা যেখানে নানা ভাষা নানামতের কিছু লোক বসবাস করে এবং ইউরোপের বর্বরদের মতো তাদের মধ্যেও তথাকথিত শ্রেণিসংগ্রাম বিদ্যমান। ভারতবর্ষের অন্তরকে, ভারতবর্ষের আত্মাকে জানার বোঝার কোনো চেষ্টাই তাঁরা করলেন না। কোন্ অদৃশ্য সূত্র এই কোটি কোটি ভারতবাসীকে একত্রে গ্রথিত করে রেখেছে, কোন্ অদৃশ্য শক্তি কোটি কোটি ভারতবাসীকে প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করছে বা কোন্ অদৃশ্য চেতনা এই ভারতের মাটিতে যাজ্ঞবল্ক্য, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ বা বুদ্ধ, শঙ্কর বা চৈতন্যের মত মহাপ্রাণ মহামানবদের জন্ম দিয়েছে তার কোনো আভাষও তাঁদের পক্ষে পাওয়া সম্ভব হল না।

অবশ্য এসব জানবার বা বুঝবার কোনো প্রয়োজন আছে বলেই তাঁরা মনে করেন না। কারণ এইসব গোঁড়া (fanatic), অর্ধশিক্ষিত ও বিকৃতবুদ্ধি মার্কসবাদীরা মনে করেন যে, পাশ্চাত্য থেকে সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের যে বড়ি তাঁরা নিয়ে এসেছেন তার থেকে ভাল আর কিছু হয় না বা হতে পারে না। যে কোনো রুগীকে এই অত্যাধুনিক দাওয়াই একবার খাওয়াতে পারলেই হল, সব রোগ নিমেষে আরোগ্য হয়ে যাবে। রুগীকে পরীক্ষা করার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নেই, শুধু সেই বড়ি তাকে গিলিয়ে দাও। তাই তাঁরা ভারতবর্ষের নাড়ী টিপে দেখারও প্রয়োজন মনে করলেন না এবং সেই বড়ি গেলাতে উদ্যত হলেন। কিন্তু সুখের কথা হল সেই বড়ি ভারতবর্ষকে দিয়ে গেলানো গেল না। ভারতবর্ষ তা বমি করে ফেলে দিল।

তাই চীনেরও আগে এই ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট পার্টি তার কাজকর্ম শুরু করা সত্ত্বেও আজ পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও কেরালা ছাড়া আর কোথাও মার্কসবাদকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। ভারতের সুসভ্য মানুষ বর্বর মার্কসবাদী তত্ত্বকে সরাসরি খারিজ করে দিয়েছে। যে তত্ত্ব শুধু মানুষের আহার-নিদ্রা আর মৈথুনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ সেই শিশ্নোদর তত্ত্বকে আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষ যে জঞ্জালের মতই আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করবে তাতে আর আশ্চর্য কি?

এই সব মার্কসবাদীদের সম্বন্ধে বলতে গেলে মাইকেলের ভাষায় বলতে হয় "পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি.....". এঁরা জানেনই না যে আমাদের পূর্বপুরুষগণ কি সম্পদ আমাদের জন্য রেখে গেছেন বা এই ভারতবর্ষের ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করার ফলে উত্তরাধিকার সূত্রে কি অমূল্য সম্পদই না আমরা পেয়েছি। তা জানলে ভিক্ষুকের মত বিদেশ থেকে মার্কসবাদের তত্ত্ব ভিক্ষা করতে যেতেন না। ভারতবর্ষের এই বৌদ্ধিক সম্পদের সম্ভার সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে আমেরিকার প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্ শ্রী উইল ডুরান্ট বলেন, "India is the motherland of our race, and Sanskrit is the mother of European languages. She was the mother of our philosophy-mother, through the Arabs, of much of our mathematics-mother through Buddha of the ideas embodied in christianity-mother, through village community of self government and democracy. Mother India is in many ways the mother of all." সেই ভারতবর্ষের সন্তান ভিক্ষাপাত্র হাতে করে বিদেশ থেকে মার্কসবাদের মত একটি অপরিণত, অমার্জিত, বর্বর তত্ত্ব ভিক্ষা করে এনেছে এবং তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করছে—এর থেকে দুঃখের ও লজ্জার বিষয় আর কি হতে পারে।

অবশ্য মার্কসবাদীরা যুক্তি দেখাবেন যে উপরিউক্ত সমস্ত ভারতীয় দর্শনই ভাববাদী এবং এরা শুধু বর্তমান জগৎকে ব্যাখ্যা করতে পারে, পরিবর্তন করতে পারে না। কিন্তু বুদ্ধিমান মার্কস এমন এক গূঢ় তত্ত্বের আমদানী করেছেন যা বস্তুবাদী, বৈজ্ঞানিক এবং জগৎকে পরিবর্তন করতে সক্ষম। বস্তু বলতে কি বোঝায় বা বস্তুর মূল কোথায় তার আধুনিক ব্যাখ্যা জানলে মার্কসবাদীদের পক্ষে বস্তুবাদী দর্শন নিয়ে লাফালাফি করা সম্ভব হত না, কারণ বস্তুর ঊনবিংশ শতাব্দীর সংজ্ঞাই তাদের জানা আছে। আর যে মার্কসবাদকে তাঁরা বৈজ্ঞানিক বলে আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ করে চলেছেন, সে সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে Bertrand Russel লিখেছেন এই বিশাল বিশ্বের মধ্যে "His (Marx's) perview is confined to this planet, and, within this planet, to man. No man who has failed to assimilate this fact has a right to call his philosophy scientific". তিনি আরও লিখেছেন, "Broadly

speaking, all the elements in Marx's philosophy, which are derived from Hegel, are unscientific in the sense that there is no reason to suppose them true." (Chapter on Marx, History of Western philosophy)।

মার্কসবাদী তত্ত্ব জগৎকে পরিবর্তন করতে পারে—একথা শুনলে মনে হবে যে মার্কসের তত্ত্ব বুঝি সূর্য-চন্দ্রের গতিপথকেও পরিবর্তিত করে দিতে পারে। কিন্তু তা নয়। মার্কসবাদী বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সীমা যেহেতু মনুষ্য সমাজ পর্যন্ত, তাই এই কথার মধ্য দিয়ে মনুষ্য সমাজের পরিবর্তনের কথাই বলা হয়ে থাকে। সমাজের সকল মানুষের স্বাধীনতা হরণ করে, সমগ্র দেশকে একটা জেলখানায় রূপান্তরিত করে, যে সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তনের কথা মার্কসের তত্ত্ব প্রচার করে, ১৯৯১ সালে রাশিয়ার জনগণ তার সমুচিত জবাব দিয়েছে। রাশিয়ার সমাজতন্ত্রের নায়ক মহামতি লেনিনের মূর্তি তাঁরই প্রতিষ্ঠিত সমাজতন্ত্রের দ্বারা লালিত-পালিত মানুষ গাঁইতি-শাবল দিয়ে ভেঙেছে শুধু নয়, সেই ভগ্ন মূর্তিতে মলমূত্র ত্যাগ করেছে।

এখানে আরও একটা কথা বলার আছে। মার্কসবাদীদের মতে মার্কসবাদ হল এক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এবং তাঁরা নিজেরা হলেন চরমভাবে বৈজ্ঞানিক মনোভাবাপন্ন। অবৈজ্ঞানিক সব কিছুই তাঁদের কাছে পরিত্যাজ এবং বৈজ্ঞানিক সব কিছুই তাঁদের আদরণীয়। এ হেন মার্কসবাদীরাই আবার বলেন যে, সংস্কৃত একটি মৃত ভাষা বা dead language, এবং তাই পরিত্যাজ্য। এ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, সংস্কৃত যে বিশ্বের সর্বাপেক্ষা বৈজ্ঞানিক ভাষা, তা তাঁদের জানা নেই। তাই এটাও অনুমান করা চলে যে, ইংরাজী science শব্দ যে সংস্কৃত ছিদ্ ধাতু (অর্থ কাটা) থেকে এসেছে তাও তাঁদের জানা নেই। সংস্কৃত ছিদ্ থেকে ল্যাটিন sciendere (to split) এসেছে। কালক্রমে এই sciendere থেকে ফরাসী sciens ও scient এসেছে। শেষ পর্যন্ত ফরাসী sciens থেকে ইংরাজী science এসেছে। কাজেই ইংরাজী science-এর জননী সংস্কৃত ছিদ্।

যাই হোক, উপরিউক্ত মার্কসবাদী সমাজ পরিবর্তনের মূল লক্ষ্য হল ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান। কিন্তু যেই চীনের সমাজতন্ত্রকে আমাদের মার্কসবাদীরা তাদের আদর্শস্থল ও প্রেরণার উৎস বলে বর্ণনা করেন, সেখানে কি অবস্থা? ছোট, মাঝারি ও বৃহৎ মিলিয়ে চীনে প্রায় ৩ লক্ষ সরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠান ছিল এবং সেগুলোতে প্রায় ২৫ কোটি শ্রমিক কাজ করত। গত ১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসের পার্টি-কংগ্রেসে রাষ্ট্রপতি জিয়াং তাঁর পরিকল্পনা (Jiang's Plan) পেশ করেন। তাতে প্রস্তাব রাখা হয় যে, মাত্র ১০০০ সংস্থাকে সরকারি আওতায় রেখে বাদবাকিগুলোকে ব্যক্তিগত মালিকানায় তুলে দেওয়া হবে। বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করার জন্য জিয়াং-এর প্রতিদ্বন্দ্বী কিয়াও শী-কে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করা হয়। ১৯৯৮ সালে এই প্রাইভেটাইজেশনের কাজ শুরু হয়েছে যা ৫ বছর ধরে চলবে এবং এর ফলে ২ কোটি ৫০ লক্ষ শ্রমিক বেকার হবে। মার্কসীয় তত্ত্বের দ্বারা সমাজ পরিবর্তনের চিত্রটা যাতে আরও পরিষ্কার হয় তাই বর্তমান চীনের উপরিউক্ত উদাহরণটি দেওয়া গেল।

ভারতবর্ষ সম্পর্কে মার্কসের চূড়ান্ত অজ্ঞতা ঃ

কোনো একটি দেশকে জানতে গেলে সর্বপ্রথম সেই দেশের ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু জানা আবশ্যক। মার্কস সারা জীবনে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সাকুল্যে দু'খানা প্রবন্ধ লিখেছেন, "ভারতে বৃটিশ শাসন" এবং "ভারতে বৃটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ ফলাফল"। পরিশিষ্ট-১ এবং পরিশিষ্ট-২

দ্রষ্টব্য। যে কেউ এই প্রবন্ধদ্বয় পাঠ করলেই বুঝতে পারবেন যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে মার্কসের জ্ঞান ছিল নিতান্ত ভাসা ভাসা এবং ভারতের জলবায়ু সম্পর্কেও তাঁর কোনো ধারণা ছিল না। ''ভারতে বৃটিশ শাসন'' প্রবন্ধের এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, ''আবহাওয়া ও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের জন্য, বিশেষ করে সাহারা থেকে শুরু করে আরব, পারস্য, ভারত ও তাতারিয়ার মধ্য দিয়ে সমুন্নত এশীয় মালভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত বৃহৎ বৃহৎ মরু অঞ্চলের অস্তিত্বের ফলে খাল ও জলাশয় থেকে কৃত্রিম সেচ ছিল প্রাচ্য কৃষির ভিত্তি। যেমন মিশর ও ভারতে, তেমনি মেসোপটেমিয়া, পারস্য প্রভৃতি দেশেও বন্যার জল দিয়ে ভূমির উর্বরতা সাধন করা হয়,....'' এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ভারতের কৃষি যে মূলত জলসেচের বদলে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর দ্বারা সৃষ্ট বৃষ্টির জলের উপর নির্ভরশীল, এই সাধারণ তথ্যটিও মার্কসের জানা ছিল না।

আর পাঁচটা সাধারণ ইয়োরোপীয়ের মত মার্কসও মনে করতেন যে একমাত্র ইয়োরোপীয় সমাজই পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুসভ্য ও সংস্কৃতি-সম্পন্ন জাতি। তাই মার্কসের চোখে ভারতবর্ষ একটা অর্ধনগ্ন, অসভ্য, জংলীদের দেশ ছাড়া আর কিছুই নয় এবং ভারতীয়দের ধর্মও নানা রকম দেবদেবী, পুতুল, গাছপালা বা প্রকৃতি পূজনকারী একটা জংলী বা pagan ধর্ম বিশেষ। সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতের হিন্দুরা যে মহান সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকার ফলেই মার্কস লিখতে পারলেন যে, ''ভারতীয় সমাজের কোনো ইতিহাস নেই। ভারতের ইতিহাস বলতে যা বোঝায় তা শুধু একের পর এক বহিরাক্রমণকারীর ইতিহাস, যারা ঐ অপ্রতিরোধী ও অচলায়তন সমাজের নিষ্ক্রিয় ভিত্তির উপর তাদের সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছে।'' তিনি আরও বিশ্বাস করতেন যে, ঐ সব পুরানো আক্রমণকারীরা সকলেই ছিল বর্বর ও তাতার, তাই তারা কালক্রমে নিজেদের অস্তিত্ব হারিয়ে ভারতীয় সমাজের সঙ্গে মিশে গিয়েছে এবং একমাত্র ''বৃটিশরাই হল প্রথম বিজয়ী যারা সভ্যতায় হিন্দুদের চেয়ে উন্নত এবং সেই হেতু তার কাছে অনধিগম্য।''

এখানে আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, মার্কস হলেন সেই ইয়োরোপীয় সমাজের প্রতিনিধি যাদের অভিধানে শ্রদ্ধা, সাধনা, ভক্তি, মোক্ষ ইত্যাদি শব্দের কোনো প্রতিশব্দ নেই। সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ গুণ সম্বন্ধে যাদের কোনো ধারণা নেই; সাত্ত্বিক জীবনযাত্রা বা সাত্ত্বিক আহার-বিহারের ধারণা যাদের কাছে নিতান্তই দুর্বোধ্য; বস্তুগত ভোগের সামগ্রী হস্তগত করে ভোগ করা এবং লালসার চরিতার্থতাই যাদের জীবনের চরম লক্ষ্য এবং এই উদ্দেশ্যে যারা আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ইত্যাদি দেশ ও মহাদেশের আদিম অধিবাসীদের নির্বিচারে হত্যা করে নিঃশেষ করে ফেলেছে; আফ্রিকার অধিবাসীদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছে, বন্দী করে নিয়ে গিয়ে আমেরিকার বাজারে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রি করেছে; নীল চাষের আমলে আমাদের দেশের কৃষক সমাজের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালিয়েছে; কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে লক্ষ লক্ষ কৃষক পরিবারকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করেছে এবং জালিয়ানওয়ালাবাগের মত জঘন্য হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছে। এইসব সুসভ্য (?) জাতিদের ধর্ম শিক্ষা দেয় যে পৃথিবীর উপর প্রভুত্ব করার জন্যই ভগবান পৃথিবীতে তাঁদের পাঠিয়েছেন। তাই নির্বিচারে প্রকৃতিকে ধ্বংস করে তারা পৃথিবীকে মনুষ্যবাসের অযোগ্য করে তুলেছে। এদের অত্যাচারে বহু প্রজাতির জীবজন্তু আজ পৃথিবী থেকে চিরতরে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে এবং আরও বহু প্রজাতি লুপ্ত হবার আশঙ্কায় দিন গুনছে।

কাজেই এইসব অসভ্য, বর্বর ও সংস্কৃতিহীন লোকেরা ভারতের সভ্যতার মহত্ত্বকেই বা উপলব্ধি করবে কেমন করে, আর তার মর্মবাণীকেই বা অনুধাবন করবে কেমন করে? এই সব অসভ্যের দল চুরি-ডাকাতি করে হঠাৎ বড়লোক হয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করতে শুরু করেছে। চীৎকার করে বলতে শুরু করেছে যে, পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র তারাই সভ্য আর সবাই অসভ্য। অথচ তাদের আচার-আচরণ প্রতি মুহূর্তে প্রমাণ দিচ্ছে যে, আজও তারা পশুত্বের উপরে বেশি দূর উঠতে পারেনি। তাই তো তাদের দেশের ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে পশুদের মতই মা-বাবার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। পতি-পত্নীর সম্পর্ক বলতে সেখানে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হবার ফলে পরিবার ধ্বংসপ্রায়। পশুদের চেয়েও অবাধ যৌন সম্ভোগের ফলে 'এইডস্' রোগ এখানে লেলিহান শিখার মতই ছড়িয়ে পড়ছে। চুরি, রাহাজানি, খুন, জখম, মাদকাসক্তি এবং নারীর প্রতি বলাৎকারে এদের সমাজ সকলের শীর্ষে। ঘন ঘন বিবাহ বিচ্ছেদের ফলে জন্ম নিচ্ছে পিতা-মাতার স্নেহ থেকে বঞ্চিত বেপরোয়া, ভয়ঙ্কর এক নাবালক অপরাধী শ্রেণি। তারা বন্দুক নিয়ে স্কুলে যাচ্ছে আর সহপাঠীদেরই মেরে শেষ করে ফেলছে।

তাই এই অসভ্যের দল যখন ভারতীয় সমাজকে অসভ্য বলে এবং এই অসভ্য সমাজের প্রতিনিধি মার্কস মন্তব্য করেন যে, "ভারতবর্ষে বৃটিশকে একটা দ্বিবিধ কর্তব্য পালন করতে হবে, একটি ধ্বংসমূলক এবং অন্যটি গঠনমূলক—পুরাতন এশিয় সমাজকে ধ্বংস করে এশিয়ায় পাশ্চাত্য সমাজের বৈষয়িক উন্নতির প্রতিষ্ঠা করা", তখন প্রশ্ন করতে ইচ্ছা হয় যে, কোন্ জিনিসটাকে মার্কস সভ্যতার নির্ণায়ক মানদণ্ড রূপে ব্যবহার করতে চান? কে কত জামাকাপড় পরে তাই যদি এই মানদণ্ড হয় তবে মার্কস সাহেবকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে এস্কিমোরা তাদের থেকে বেশি সভ্য। আর গায়ের রঙের বিভিন্নতা যদি অসভ্যতার মাপকাঠি হয় তবে তার উপযুক্ত জবাব—ঘোড়াই বিভিন্ন রঙের হয়, আর গাধা সব এক রঙেরই হয়।

দাম্ভিক মার্কসের মতে ভারতের কোনো অতীত ইতিহাস নেই। কাজেই মেনে নিতে হয় যে, তাঁর দেশ জার্মানীর অবশ্যই অতীত ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাস কি মার্কস সাহেব কখনও অধ্যয়ন করে দেখেছেন যে, ভারতে যখন ঋগ্বেদ, সামবেদ ইত্যাদি, কিংবা রামায়ণ, মহাভারত, সাঙ্খ্য দর্শন, অর্থশাস্ত্র ইত্যাদি রচিত হচ্ছিল তখন তাঁর দেশবাসীরা পুরানো প্রস্তর না নব্য প্রস্তর যুগে ছিল? তখন কি তারা আগুন জ্বালাতে শিখেছিল না কাঁচা মাংস খেত? নাকি তখন তাঁরা পুরোপুরি মানুষ হয়েই ওঠেনি, শাখামৃগ হয়ে গাছে অবস্থান করছিল?

যাইহোক, মার্কস বিপ্লবের গুরু। তাই একজন যকৃতের রুগী যেমন সব কিছুকে হলুদ দেখে, তিনিও সেই রকম সব কিছুর মধ্যেই বিপ্লব দেখতে পান। তাই তো তিনি বৃটিশের দ্বারা ভারতীয় বয়ন শিল্পের নির্মম ধ্বংসের মধ্যেই বিপ্লব দেখতে পেয়েছেন এবং লিখেছেন, "ইংরাজের হস্তক্ষেপ সূতাকাটুনীর স্থান করেছে ল্যাংকাশায়ারে আর তাঁতীর স্থান রেখেছে বাংলায়; অথবা হিন্দু সূতাকাটুনী ও তাঁতী উভয়কেই নিশ্চিহ্ন করে ঐ সব ছোট ছোট অর্ধবর্বর, অর্ধসভ্য গোষ্ঠীগুলোকে ভেঙে দিয়ে তাদের অর্থনৈতিক ভিত্তিতে ধ্বংস করেছে এবং এইভাবে সে যে সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত করেছে তা এশিয়ায়, এতদিন যা শোনা গেছে তার মধ্যে, সর্ববৃহৎ এবং সত্যি কথা বলতে, একমাত্র বিপ্লব"।

তাহলে মার্কসের মতে বিপ্লব বলতে কি বোঝায়? ভারতের (বা বৃহদর্থে এশিয়ার) যা কিছু বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা আছে তার সব কিছুকেই বিসর্জন দিয়ে বা বলপূর্বক ধ্বংস করে সমস্ত ইয়োরোপীয় হালচালকে অন্ধভাবে অনুকরণ করা এবং ভারতের মাটিতে তাদের সুপ্রতিষ্ঠিত

করার নামই কি বিপ্লব? হ্যাঁ তাই, কারণ এই অসভ্য ভারতীয় সমাজকে সুসভ্য করে গড়ে তুলতে আর কোনো রাস্তাই মার্কস খুঁজে পাচ্ছেন না এবং এইভাবে বিপ্লব রপ্তানী করে ইংরাজরা ভারতের যে মহান উপকার করে চলেছে তার প্রশংসা না করে পারছেন না। তাই লিখছেন, "বৃটিশের যত দোষই থাক না কেন, তবুও সে নিজের অজান্তেই এই বিপ্লবের কাজ করে যাচ্ছে।" তাহলে প্রশ্ন থাকছে যে, এই রকম একটা বিপ্লব ঘটাবার জন্যই কি আমাদের মার্কসবাদীরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন? তাহলে তাঁদের এই পরামর্শই দিতে হয় যে, কেন তাঁরা আর বৃথা খাটাখাটি করবেন? তার থেকে বরং বৃটিশদের বা অন্য ইয়োরোপীয়দের ডেকে নিয়ে আসুন। তাঁরা সেই বিপ্লব অনেক ভালভাবে এবং অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে করতে পারবে।

মার্কসের ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ ঃ

উপরিউক্ত মন্তব্যগুলির মধ্যে মার্কসের একটি মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বাংলার বয়নশিল্পীদের তিনি অর্ধবর্বর ও অর্ধসভ্য বলেছেন। এখানে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, এককালে বাংলার রেশম ও সূতীবস্ত্র ছিল পৃথিবীর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট এবং ঢাকার মসলীন কাপড়ের কথা বিশদভাবে বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। বাংলার এই উৎকৃষ্ট সূতী ও রেশম বস্ত্রই খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে রোমের ঐতিহাসিক প্লীনি (প্রথম)-কে দুঃখ করে বলতে বাধ্য করেছিল যে, ঐসব শৌখিন বস্ত্র আমদানী করতে প্রচুর সোনা ও রূপার বাট (bullion) ভারতে চলে যাচ্ছে। ঐ উৎকৃষ্ট বস্ত্রসামগ্রীই ১৭০০ ও ১৭২০ সালে (আজকের অতিশয় সভ্য) বৃটেনের পার্লামেন্টকে বাধ্য করেছিল আইন করে বৃটেনে তার আমদানী বন্ধ করতে। কারণ একই, বহু সোনা-রূপা খরচ হওয়া। উপরন্তু ঐ আইনে এটাও বলা হয়েছিল যে, কোনো বৃটেনবাসী ভারতে প্রস্তুত কাপড় অন্যায়ভাবে ব্যবহার করলে ২০০ পাউন্ড জরিমানা হবে। এক মহিলার কাছ থেকে জরিমানা আদায়ও করা হয়েছিল।

কাজেই ঐ সব শ্রদ্ধাভাজন নিপুণ শিল্পীদের অর্ধবর্বর ও অর্ধসভ্য বলে, নিজের পাহাড় প্রমাণ অজ্ঞতা প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে, মার্কস তাঁর শালীনতার সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করেছেন। ঐ একটি উক্তির জন্য মার্কসের সমস্ত রচনা ভারতে নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়া উচিত। প্রকৃতপক্ষে সেটাই হবে মার্কসের ঔদ্ধত্য ও অসভ্যতার সমুচিত জবাব এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের সম্মান রক্ষার অন্যতম উপায়।

কিন্তু উচিত হলেও আমরা তা করি না। কারণ বিগত হাজার বছর ধরে গোলামি করতে করতে আমাদের চামড়া গণ্ডারের মতোই মোটা হয়ে গেছে। আত্মসম্মানবোধ বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। তার উপর বিগত ৫০ বছরের অপরিণামদর্শী, উদ্দেশ্যহীন এবং দেশপ্রেমহীন কংগ্রেসের শাসন সেই গোলামির মনোভাবের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। দেশের মানুষের মনে সামান্যতম জাতীয়তাবোধ বা স্বাভিমান জাগাতে পারেনি। তাই তো বিগত দু'শো বছর যারা আমাদের দেশ দখল করে শাসন করে গেল, আমাদের দেশবাসীর উপর অকথ্য অত্যাচার করে গেল, দেশকে লুণ্ঠন করে নিজেদের উদর স্ফীত করল, আমাদের মা-বোনের সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেললো, ভারতের মাটিতে পা রাখলে যে পাপিষ্ঠদের কুকুরের মতোই তাড়ানো উচিত, তাদের আবার আমরা সম্মান করে ডেকে নিয়ে আসি—আমাদের সর্বপ্রধান জাতীয় উৎসব, প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে তাদের প্রধানমন্ত্রীকে প্রধান অতিথি বানাই।

হিন্দুধর্ম সম্পর্কে মার্কসের অজ্ঞতা ঃ

মার্কস ভৌগোলিক ভারতবর্ষকে তুলনা করেছেন ইতালীর সঙ্গে, কারণ ভারতের মতো ইতালীর তিনদিকে সমুদ্র। কিন্তু সাধারণ ভারতবাসীকে তুলনা করেছেন দারিদ্র্যগ্রস্ত আয়ারল্যান্ডের অধিবাসীদের সঙ্গে। পক্ষান্তরে তাঁর শোষক-শোষিতের তত্ত্ব অনুযায়ী ভারতের শাসকশ্রেণিকে তুলনা করেছেন তৎকালীন সমৃদ্ধিশালী ইতালীর লোকেদের সঙ্গে। তাই লিখছেন, "ইতালী ও আয়ারল্যান্ড—ভোগাবিলাসী এক জগতের সঙ্গে দুর্দশাগ্রস্ত এক জগতের এই বিচিত্র মিলন হিন্দুস্থানের প্রাচীন ধর্মীয় ঐতিহ্যের মধ্যেই সূচিত। এ ধর্ম যুগপৎ যৌন তেজস্বিতা (sexual exuberence) ও আত্মনিগ্রহী কৃচ্ছ্রসাধনের ধর্ম; লিঙ্গম্ আর জগন্নাথের ধর্ম, সন্ন্যাসী ও দেবদাসীর ধর্ম।"

অর্থাৎ মার্কস যা বলতে চেয়েছেন তার সার কথা হল—ভারতের সমৃদ্ধিশালী, শোষক শ্রেণির ধর্ম হল লিঙ্গম্, যৌন তেজস্বিতা আর দেবদাসীর ধর্ম এবং দুর্দশাগ্রস্ত শোষিত শ্রেণির ধর্ম হল আত্মনিগ্রহ, কৃচ্ছ্রসাধন ও সন্ন্যাস। অর্থাৎ মার্কসের ধারণা, ভারতের শোষিত শ্রেণির লোকেরা আর্থিক দুর্দশার জন্যই আত্মনিগ্রহ ও কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়ে সন্ন্যাসী হয়—সোজা বাংলায়, না খেতে পেয়ে সন্ন্যাসী হয়। কাজেই মার্কসের মতে চৈতন্য মহাপ্রভু, শঙ্করাচার্য, গৌতম বুদ্ধ, স্বামী বিবেকানন্দ, সবাই না খেতে পেয়ে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন।

আসল কথা হল, মার্কসের মত দেহসর্বস্ব লোকেরা যাঁরা ছোটবেলা থেকে ভোগবাদী পরিবেশের মধ্যে বড় হয়েছেন, ভোগবাদী ধ্যান-ধারণায় অভ্যস্ত হয়েছেন, তাঁদের পক্ষে এর চেয়ে বেশি কিছু ভাবা বা ধারণা করা সম্ভব নয়। এরা হল 'খাও পিও জিও' সমাজের লোক। এরা বুঝবেন কি করে যে, কেন একজন রাজপুত্র সমস্ত ভোগবিলাস ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়। একজন মানুষ যে ত্যাগ, বৈরাগ্য ও সাধনার দ্বারা দেবত্বে উপনীত হতে পারে, এদের ধর্মও তা শিক্ষা দেয় না। এদের ধর্ম শিক্ষা দেয় যে, মানুষ হল মূলত পাপী এবং শয়তানের দ্বারা পরিচালিত। তাই একটা ভেড়া পবিত্র হতে পারে কিন্তু মানুষ কখনও পবিত্র হতে পারে না।

কাজেই একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, মার্কস যদি রামায়ণ পড়তেন তবে পিতৃসত্য রক্ষার জন্য রাজ্যপাট ছেড়ে দিয়ে স্বেচ্ছায় চৌদ্দ বছরের জন্য রামের বনবাসে যাওয়াকে নিরেট মূর্খামী বলেই মনে করতেন। পক্ষান্তর সেই পরিস্থিতিতে যদি তিনি বুদ্ধিমান ও পরাক্রমশালী ঔরঙ্গজেবের মত তিন ভাইকে হত্যা করে এবং রাজা দশরথকে বন্দী করে অযোধ্যার সিংহাসন দখল করতেন তবেই মার্কসের প্রশংসার যোগ্য হতেন।

এখানে একটা আশ্চর্যের ব্যাপার হল, যে হিন্দুধর্মে ইন্দ্রিয় সংযম ও ইন্দ্রিয় দমন হল সকল সাধনার প্রথম শর্ত, সেই হিন্দুধর্মে মার্কস ইন্দ্রিয় পরায়ণতা ও যৌন তেজস্বিতার খবর পেলেন কোথা থেকে? বর্তমান লেখকের অনুমান যে, কোনো সূত্রে হয়তো শিবলিঙ্গের ছবি দেখার তাঁর সুযোগ হয়েছিল। তার তত্ত্বগত আসল ব্যাখ্যা না জানার ফলে তাঁর নিজস্ব ব্যাখ্যা, যা তাঁর বুদ্ধিতে কুলিয়েছে, তাই করেছেন। আসল তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বুঝে ওঠার মত ধীশক্তি তাঁর ছিল কি না, সে প্রশ্নে না যাওয়াই ভাল।

ঠিক একই ভাবে, অদ্বৈতবাদী ভারতবর্ষ যখন ব্রহ্মজ্ঞানে বা "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" জ্ঞানে সমস্ত প্রকৃতিকে শ্রদ্ধা ও পূজা করে এবং "একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধাবদন্তি" অনুসরণ করে বিভিন্ন দেবদেবীর আরাধনা করে, তখন সেটা যে মার্কসের চোখে জংলী বা pagan বলে মনে হবে

তাতে আর আশ্চর্য কি? ঠিক সেই রকম ভারতের ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান না থাকায় মার্কস অবাক হয়ে ভাবেন, কেমন করে "প্রকৃতির সম্রাট মানুষ, হনুমানরূপী বানর বা সাব্বালা (?) রূপী গোরুর পায়ে লুটিয়ে পড়ে!" তবে বরফ গলতে শুরু করেছে। সবে তারা ভারতের ভক্তিবাদের আস্বাদ পেয়ে মাথা মুড়িয়ে খোল করতাল নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় কীর্তন করতে শুরু করেছে। যে জগন্নাথ শব্দ তারা উচ্চারণ করতে পারত না, Jaggernaut বলে হাসি-তামাশা করত, সেই প্রভু জগন্নাথ আজ রথে চড়ে লন্ডন, নিউইয়র্ক, প্যারিস, সানফ্রানসিস্কো, সিড্নী বা মস্কোর রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এর চেয়ে সুখের আর কি হতে পারে? যারা সংস্কৃত উচ্চারণ করতে পারে না তারাও গীতা, ভাগবৎ আবৃত্তি করছে বা হরে কৃষ্ণ মহানাম জপ করছে। তবে ভারতের জ্ঞানমার্গ বা নিষ্কাম কর্মের মার্গ বুঝতে হয়তো তাদের আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।

মার্কস ও খ্রিস্টধর্ম ঃ

মার্কস দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, খ্রিস্টধর্মই হল সভ্য সমাজের একমাত্র ধর্ম এবং শ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং ভারতে এই ধর্মের প্রসার ঘটাতে পারলে ভারতের অসভ্য জংলী মানুষগুলোর কিছুটা উন্নতি হত—এক কথায় কিছুটা সভ্য হত। তাই তিনি বৃটিশদের দোষারোপ করছেন এবং কৈফিয়ত তলব করে বলছেন, "যখন তারা (ব্রিটিশরা) পবিত্র খ্রিস্টধর্মকে রক্ষার ছুতো দিয়ে ফরাসী বিপ্লবের বিরোধিতা করেছে এবং (ফরাসীদের সঙ্গে) যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে, সেই একই সময়ে তারা ভারতে ঐ ধর্মের ব্যাপক প্রসারে বাধা দেয়নি? বাংলা ও উড়িষ্যার মন্দিরগুলিতে যে সব তীর্থযাত্রীদের সমাগম হয় তাদের কাছ থেকে টাকা কামানোর উদ্দেশ্যে তারা জগন্নাথের মন্দিরে নরবলি ও বেশ্যাবৃত্তির ব্যবসা ফেঁদে বসেনি?" অর্থাৎ মার্কসের মতে ব্রিটিশরা এতই নীচ ও ঘৃণ্য যে তারা ভারতবর্ষের অসভ্য মানুষগুলোকে চিরকালের মতো অসভ্য ও অনগ্রসর করে রাখার হীন উদ্দেশ্যে সেখানে খ্রিস্টধর্মের ব্যাপক প্রসারে বাধা দিয়েছে। শুধু তাই নয়, ঐ একই হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে তারা সেখানকার মন্দিরগুলিতে নরবলি, বেশ্যাবৃত্তি ইত্যাদি জঘন্য কাজে উৎসাহ দিয়েছে।

এখানে একটা ব্যাপার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যে খ্রিস্টধর্মের জন্য মার্কস ওকালতি করছেন, সেই খ্রিস্টধর্ম তাঁর নিজের দেশ জার্মানীতে আবির্ভূত হয়নি। খ্রিস্টধর্ম শুরু হয়েছিল সুদূর প্যালেস্টাইনে। মার্কস কি কখনও অনুসন্ধান করে দেখেছেন যে, খ্রিস্টধর্মের আগমনের পূর্বে জার্মানীতে কি ধর্মমত প্রচলিত ছিল? আর কেমন করে খ্রিস্টধর্ম আসার ফলে অতি দ্রুত তা লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল? সমূলে বিনষ্ট হয়েছিল? মার্কসের পক্ষে এটা খেয়াল রাখা উচিত ছিল যে, ভারতের হিন্দুধর্ম বর্বর হোক, জংলী হোক, যাই হোক না কেন, ২০০ বছর ধরে খ্রীস্টধর্মের আক্রমণে বিনষ্ট হয়ে যায়নি। কিংবা তারও আগে ইসলামের বর্বর, নৃশংস আক্রমণকে ৮০০ বছর ধরে প্রতিহত করে সে তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে, লুপ্ত হয়ে যায়নি। অন্তর্নিহিত শক্তির বলেই সে তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পেরেছে। পক্ষান্তরে তাঁর উন্নত খ্রিস্টধর্ম, ইসলামের আক্রমণ প্রতিহত করতে না পারার ফলে স্পেন থেকে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

আমাদের মার্কসবাদীদের চরিত্র ঃ

কাজেই প্রশ্ন থাকছে যে, ভারতের মার্কসবাদীরা, যাঁরা মার্কসবাদে অবিচল বিশ্বাস রাখেন, তাঁরা কি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে মার্কসের উপরিউক্ত ধ্যানধারণাগুলোকেও বিশ্বাস করেন? তাঁরাও কি বিশ্বাস করেন যে ভারতের হিন্দু জাতি ইয়োরোপীয়দের তুলনায় জংলী ও অসভ্য? তাঁরাও কি বিশ্বাস করেন যে, ভারতের কোনো অতীত ইতিহাস নেই? তাঁরাও কি বিশ্বাস করেন যে, ভারতের সনাতন ধর্ম জংলী ধর্ম ছাড়া আর কিছুই নয় এবং সেই তুলনায় খ্রিস্টধর্ম অনেক সভ্য ও মহৎ? তাঁরাও কি বিশ্বাস করেন যে, ভারতবর্ষকে ইয়োরোপের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে? তাহলে এই কথাই বলতে হয় যে, ঐ সব বিজাতীয় ও দেশদ্রোহী মার্কসবাদীদের ভারতে থাকার কোনো অধিকার নেই—সভ্য হবার জন্য তাদের ইয়োরোপে চলে যাওয়া উচিত।

আমাদের মার্কসবাদীরা, বিদেশী ঐতিহাসিকদের উদ্দেশ্য-প্রণোদিত এই বিকৃত মতবাদে বিশ্বাসী যে, তথাকথিত দ্রাবিড় ও আদিবাসী নামে চিহ্নিত বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীভুক্ত লোকেরাই ভারতের মূল বাসিন্দা এবং সেই জনগোষ্ঠী আর্য নামে পরিচিত তারা বহিরাগত। তাঁরা আরও বিশ্বাস করেন যে, সেই তথাকথিত আর্যরা ঐ সব আদিম অধিবাসীদের দাসত্বে বাধ্য করেছে। তাদের সমস্ত কৃষিযোগ্য উর্বর জমি বলপূর্বক কেড়ে নিয়েছে, তাঁদের উপর অকথ্য অত্যাচার ও নির্যাতন চালিয়েছে এবং সমস্ত দিক দিয়ে তাদের শোষণ করেছে। গ্রীক ও রোমান আমলে ইয়োরোপের ক্রীতদাস মালিকরা ক্রীতাদাসদের উপর যে রকম অত্যাচার ও নিপীড়ন চালাতো, আর্যরাও এদের 'শূদ্র' নামে অভিহিত করে একই রকম অত্যাচার ও নিপীড়ন চালিয়েছে।

এ থেকে আমাদের মার্কসবাদীরা দেখাতে চান যে, মার্কস তাঁর ঐতিহাসিক বস্তুবাদের তত্ত্বে যে ক্রীতদাস সমাজের কথা বলেছেন, ভারতেও সেই সমাজের অস্তিত্ব ছিল। এটা প্রমাণ করা তাদের পক্ষে খুবই জরুরী কারণ এটা না দেখাতে পারলে তাঁদের পক্ষে মার্কসের তত্ত্বকে অভ্রান্ত ও সার্বজনীন বলে প্রচার করতে খুবই অসুবিধা হবে।

অবিভক্ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন নেতা শ্রী এস. এ. ডাঙ্গে মহাশয় তাঁর "Slavery in India" গ্রন্থে এই সব দিকগুলোকেই সাক্ষ্যপ্রমাণ সহকারে প্রতিষ্ঠা করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। মুনিঋষিদের তপোবনকে তিনি জমিদারি বলেছেন। শিক্ষাগ্রহণের জন্য আগত আশ্রমবালকদের তিনি ক্রীতদাস-কৃষি-শ্রমিক বলেছেন। অবসর বিনোদনের জন্য আসা রাজা-মহারাজাদের সঙ্গদানকারী হিসাবে আশ্রমবালিকাদের বর্ণনা করেছেন এবং এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই শকুন্তলা ও রাজা দুষ্মন্তের কাহিনী ব্যাখ্যা করেছেন। তাড়কা বধ, একলব্যের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দান প্রভৃতিকে বলপূর্বক শূদ্র দমন বলেছেন ইত্যাদি।

কিন্তু তৎকালীন ভারতীয় সমাজকে নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, যে নৃশংস ও বর্বর ইয়োরোপীয় সমাজের সঙ্গে শ্রীডাঙ্গে ভারতীয় সমাজকে তুলনীয় বলে বলতে চাইছেন সাক্ষ্য প্রমাণ সে-কথা বলে না। সেই সময়কার ইয়োরোপীয় সমাজ ক্রীতদাস ও স্বাধীন নাগরিক, এই দুই শ্রেণিতে সরাসরি ভাগ হয়ে গিয়েছিল এবং ইয়োরোপের তিন-চতুর্থাংশ অধিবাসী ক্রীতদাসে পবিণত হয়ে গিয়েছিল। ইয়োরোপের বড় বড় হাটে রোজ প্রায় দশ হাজার ক্রীতদাস কেনা-বেচা হত এবং শৃংখলিত ঐ সব হতভাগ্যদের স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করার কোনো অধিকার তো ছিলই না বরং পশুর চেয়েও জঘন্য জীবনযাপনে তাঁদের বাধ্য করা হত। ভারতীয় ইতিহাসের কোনো একটা পর্যায়ে এই রকম বীভৎস একটা সামাজিক পরিস্থিতি ছিল কোনো রকম সাক্ষ্য

প্রমাণ দিয়েও তা প্রমাণ করা সম্ভব নয়। ভারতীয় সমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চার বর্ণে বিভক্ত ছিল। কাজেই ইয়োরোপের মত ভারতীয় সমাজও ক্রীতাদাস ও স্বাধীন নাগরিক, এই দুই শ্রেণিতে সরাসরি বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল তা খুবই কষ্ট-কল্পনা।

ক্রীতদাসদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হবে, এ ব্যাপারে রোমান লেখক ক্যাটো (Cato)-র মত হল, তাদের খাবার কাজের উপর নির্ভর করবে। বছরের যে যে সময় কৃষিকাজ সর্বাপেক্ষা শ্রমসাধ্য, তখন তাদের খাদ্যের পরিমাণ বাড়াতে হবে এবং অল্প খাটুনির সময় বরাদ্দ কমিয়ে দিতে হবে। তা ছাড়া তিনি বাগান ও ক্ষেতের মালিকরদের পরামর্শ দিচ্ছেন, বৃদ্ধ গোরুবলদ ও পুরানো লোহালক্কড়ের সঙ্গে বয়স্ক ও রুগ্ন ক্রীতাদাসদের বেচে দিতে। সমুদ্রে ঝড় উঠলে জাহাজ হাল্কা করার জন্য ঘোড়াকে আগে জলে ফেলতে হবে, না ক্রীতদাসকে আগে জলে ফেলতে হবে? এ ব্যাপারে সিসেরো (Cicero)-র মত হল, ক্রীতদাসকেই আগে জলে ফেলা উচিত। সিসেরো, পিন্ডার, হোরেস প্রভৃতি রোমান লেখকদের মতে দুর্ভিক্ষের সময় ক্রীতদাসদের হয় বেচে দিতে হবে, নয়তো না খেতে দিয়ে মেরে ফেলতে হবে। তা ছাড়া ওই সব লেখকরা, স্বাধীন রোমক যুবকদের সুবিধার্থে ক্রীতদাসীদের গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করার জন্যও উপদেশ দিতেন। (এই প্রসঙ্গে আরও তথ্যের জন্য বর্তমান লেখকের "পুরুষার্থ প্রসঙ্গ: পাশ্চাত্য বনাম ভারতীয় ভাবধারা" দ্রষ্টব্য।)

ভারতে ক্রীতদাস প্রথা ছিল না ঃ

পক্ষান্তরে "মনুসংহিতা" থেকে তৎকালীন ভারতীয় সমাজের যে চিত্র পাওয়া যায়, এবং বিশেষ করে ঐ গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে শূদ্র সম্পর্কে যে সমস্ত শ্লোক রয়েছে তাতে দেখা যায় যে, "শূদ্র মাত্রই দাস্যকর্মের উপযুক্ত" এই কথাই বলা হয়েছে। শূদ্র মাত্রই দাস এ কথা বলা হয়নি। এ প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় তা হল, সংস্কৃত "দাস" শব্দের দ্বারা কেবল ক্রীতদাস বোঝায় না, সাধারণ গৃহভৃত্যকেও বোঝায়। বৃহদর্থে যে কোনো বেতনভোগী কর্মচারীও দাস। "দাসী বা দাসপত্নীতে শূদ্রের যে পুত্র হয়, ঐ পুত্র শূদ্র পিতার অনুজ্ঞামতে উহার ঔরস-পুত্রের তুল্যভাগী হইবে, ইহাই শাস্ত্রীয় বিধান" (৯/১৭৯)। মনুসংহিতার উপরিউক্ত শ্লোক প্রমাণ করেছে যে, শূদ্রেরও দাসদাসী ছিল বা থাকা সম্ভব ছিল। কাজেই শূদ্র মাত্রই দাস ছিল, মার্কসবাদীদের এই সিদ্ধান্ত সত্যের অপলাপ ও ইতিহাসের বিকৃতিকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। এ ছাড়া উক্ত গ্রন্থের দশম অধ্যায়ে শূদ্রের অনেক স্বাধীন পেশার উল্লেখ আছে, কিন্তু ক্রীতদাসের কোনো স্বাধীন পেশা থাকা সম্ভব নয়।

"বৈশ্যের অভাবে শূদ্রগৃহ হইতে (ব্রাহ্মণ) ইচ্ছামত দুই বা তিনটি যজ্ঞীয় দ্রব্য গ্রহণ করিবে" (১১/১৩)। "যজ্ঞের নিমিত্ত শূদ্রের নিকট ধন যাচ্ঞা করা ব্রাহ্মণের উচিত নয়" (১০/২৪)। "যদি পশুযাগ ও সোমযাগ না হইয়া থাকে তবে তদুদ্দেশ্যে শূদ্র হইতেও ধন গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ বৎসরান্তে বৈশ্বানরী ইষ্টি করিবেন" (১১/২৭)।—ইত্যাদি শ্লোকগুলি অকাট্যভাবে স্বাধীন ও বিত্তশালী শূদ্রের অস্তিত্ব স্বীকার করছে। ক্রীতদাসের কাছে কেউ আর্থিক সাহায্য চাইতে পারে না এবং তাদের কোনো স্বাধীন গৃহও থাকা সম্ভব নয়।

"...অনুপযুক্ত ব্রাহ্মণকে রাজা ধর্মপ্রবক্তাপদে নিযুক্ত করিতে পারেন, পরন্তু সর্বগুণান্বিত ধার্মিক ও ব্যবহারজ্ঞ শূদ্রকে ঐ পদে নিযুক্ত করিতে পারেন না। যে রাজার সামনে শূদ্র ন্যায়ান্যায় ধর্ম বিচার করে সেই রাজার রাষ্ট্র শীঘ্রই পঙ্কে পতিত গোরুর ন্যায় অবসন্ন হয়" (৮/২০, ২১)। এই

শ্লোক থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ধার্মিক, বিদ্বান বা রাজার অমাত্যপদে আসীন হবার মত সর্বগুণান্বিত শূদ্রও বিরল ছিল না। তা ছাড়া মহাভারতে শূদ্র রাজার কন্যা সত্যবতীর সঙ্গে শান্তনুর বিবাহ এবং শূদ্র রাজাদের সসৈন্যে কুরুক্ষেত্রে যোগদান, স্বাধীন শূদ্র রাজার অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে লিখেছেন, "কোন ম্লেচ্ছ যদি তার সন্তানকে দাস হিসাবে বিক্রি করে বা বন্ধক রাখে তবে তা দণ্ডনীয় হবে না। তবে আর্যদের মধ্যে যে কোন রকমের দাসত্বপ্রথা সম্পূর্ণ ভাবে নিষিদ্ধ" (৩/১৩/৩৪) পণ্ডিতগণের মতে ম্লেচ্ছ শব্দের দ্বারা বিদেশী বোঝায় এবং শূদ্র কিংবা তার থেকেও পতিত (অশাস্ত্রীয় বিবাহের দ্বারা) কোনো ব্যক্তিও আর্য বলে গণ্য। যে কোন মার্কসবাদী উক্ত গ্রন্থের উক্ত প্রকরণে বর্ণিত ক্রীতাদাস বিষয়ে আলোচনা পড়লে বুঝতে পারবেন যে ভারতীয় সমাজ কত সভ্য ও মানবিক ছিল। ইয়োরোপ যেখানে ক্রীতদাসকে না খেতে দিয়ে মেরে ফেলার কথা বলছে, কৌটিল্য সেখানে বলছেন যে, নাবালক ম্লেচ্ছ ক্রীতদাসকেও যদি তাঁর মালিক কোনো নোংরা কাজে নিযুক্ত করে তবে সেই মালিকের অর্থদণ্ড হবে। রোমের লেখকরা ক্রীতদাসীদের গণিকাবৃত্তি করতে বলছেন, পক্ষান্তরে কৌটিল্য বলছেন, ক্রীতদাসীর সঙ্গে কোনো রকম অশালীন কথা বললে বা ইঙ্গিত করলে তার দণ্ড হবে (৩/১৩/১১,১২)।

মনুসংহিতায়, সাত রকম দাসের বর্ণনা আছে, যেমন (১) যুদ্ধবন্দী দাস, (২) অন্নের জন্য দাস, (৩) গৃহস্থ দাসীর পুত্র দাস, (৪) দদ্রিম বা অন্য কেউ দিয়েছে এমন দাস, (৫) পৈতৃক বা পিত্রাদিক্রমাগত দাস, (৬) দণ্ডদাস বা রাজার শাস্তিস্বরূপ দাস্যবৃত্তি করছে এমন, এবং (৭) ক্রীত বা পয়সা দিয়ে কেনা দাস; (৮/৪১৫)। এর মধ্যে একমাত্র 'ক্রীত' শ্রেণির দাসই ইয়োরোপের ক্রীতদাসের পর্যায়ে পড়ে। কাজেই ইয়োরোপের মত ক্রীতদাসের হাটে হাজার হাজার দাস কেনা-বেচার ঘটনাও ভারতে অনুপস্থিত। ইত্যাদি আরও নানা তথ্য-প্রমাণ হাজির করে দেখানো যেতে পারে যে ইয়োরোপের মত জঘন্য ক্রীতদাস প্রথা ভারতে কোনো কালেই ছিল না। এই কারণে মেগাস্থিনিস তাঁর বিবরণে লেখেন যে, ভারতে ক্রীতদাস প্রথা নেই।

আরও একটা কথা এখানে বলে রাখা যুক্তিযুক্ত হবে যে, শুধু ভারতের নয়, পাশ্চাত্যের, বিশেষ করে তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়ার পণ্ডিতরাও ভারতে ক্রীতদাস প্রথার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে বিশেষ চেষ্টা চালায়। কিন্তু মেগাস্থিনিসের মন্তব্য তাদের সকল অপচেষ্টায় জল ঢেলে দেয়। মেগাস্থিনিসের মন্তব্য উপেক্ষা করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না, কারণ সে একজন ইয়োরোপীয়। দ্বিতীয়তঃ, মেগাস্থিনিস ইয়োরোপীয় ক্রীতদাস প্রথার একজন প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। এই সব ঘটনা থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে, শ্রীডাঙ্গে সহ আমাদের মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীদের ভারতচর্চা, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করে সত্য উদ্ঘাটনের প্রচেষ্টা নয়, বরং গায়ের জোরে ইতিহাসকে বিকৃত করে তাকে মার্কসবাদী তত্ত্বের উপযোগী করে তোলার অপচেষ্টা মাত্র। এ থেকে আরও একটা জিনিস প্রমাণ হয় তা হল, নিজের দেশের ইতিহাস, সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি তাদের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই, তাদের যত শ্রদ্ধা সব শুধু বিদেশী মার্কস ও তাঁর তত্ত্বের প্রতি। পাঠক যদি শ্রীডাঙ্গের উল্লিখিত পুস্তকটি সংগ্রহ করে একবার পড়েন তবে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি কালিমা লেপন করার মার্কসবাদী কায়দার সঙ্গে কিছুটা পরিচিত হতে পারবেন। রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, উপনিষদ ইত্যাদি আমাদের প্রাচীন গ্রন্থাদিরও যে কি রকম কুৎসিত অপব্যাখ্যা মার্কসবাদীরা করতে পারে সে সম্বন্ধেও কিছুটা ধারণা করতে পাববেন। তবে সুখের কথা হল, হিমালয়কে গাঁইতি দিয়ে আঘাত করলে যেমন হিমালয়ের কিছু যায় আসে না, বরং যে

গাঁইতি মারে তারই পরিশ্রম সার হয়, সেই রকম গীতা, উপনিষদ ইত্যাদিকে আঘাত করে মার্কসবাদীরা শুধু তাদের গা-হাত-পা ব্যথা করছেন। হিমালয় যেমন ছিল তেমনই আছে। পোকা যেমন গ্রন্থের মহত্ত্ব বোঝে না, শুধু কাটে, আমাদের মার্কসবাদী অজ্ঞের দলও সেই রকম গ্রন্থের মহত্ত্ব না বুঝে পোকার মত কেটে চলেছে।

মার্কসীয় তত্ত্ব ভারতে প্রযোজ্য নয় ঃ

এখানে আরও একটা বিষয় বলা দরকার। ইয়োরোপের মত ক্রীতদাস প্রথার সমাজ যেমন ভারতে ছিল না, তেমনি ইয়োরোপের মত জঘন্য সামন্ততন্ত্রও ভারতে ছিল না। সেই সময় ইয়োরোপীয় সমাজ সামন্ত প্রভু (লর্ড, ম্যানর ইত্যাদি) ও ভূমিদাস বা সার্ফ (Serf), এই দুই শ্রেণিতে ভাগ হয়ে গিয়েছিল, ভারতে যা কোনো দিনই হয়নি। ব্রিটিশ এদেশে আসার পর লর্ড কর্নোয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে এ দেশে ইয়োরোপীয় সামন্তপ্রথার পত্তন করে। এই সামন্তপ্রথার মূল লক্ষণ হল, চাষি যেহেতু জমির মালিক নয় তাই জমি হস্তান্তর বা বেচাবিক্রি করার তার কোনো অধিকার নেই। কিন্তু ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় চাষিই জমির মালিক ছিল এবং সে জমি কেনা-বেচা করতে পারত। সেই সঙ্গে সঙ্গে ইয়োরোপের মত ধনতন্ত্র বা ক্যাপিটালিজ্‌ম যে ভারতে হয়নি তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই এই দিক থেকে বিচার করলে, মার্কস সাহেবের ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ভারতবর্ষে পুরোপুরি অচল। উল্লিখিত ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বলে যে, আদিম সমাজতন্ত্র থেকে শুরু করে মানব সমাজ একে একে ক্রীতাদাস প্রথার সমাজ, সামন্ততন্ত্রের সমাজ ও বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্রে উন্নীত হবে। কিন্তু ভারতে যেহেতু ক্রীতাদাস প্রথার সমাজ ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ছিল না, তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে মার্কসের উপরিউক্ত তত্ত্ব ইয়োরোপের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, ভারতের ক্ষেত্রে নয়। তাই ধনতান্ত্রিক সমাজকে বিপ্লবের দ্বারা অপসারিত করে মার্কসবাদীরা এখানে মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করবেন সে আশা দুরাশা মাত্র।

ক্ষমার অযোগ্য যে অপরাধ মার্কসবাদীরা করে চলেছেন তা হল, ভারতবর্ষকে তাঁরা জানতে চেষ্টা করেছেন বিদেশী বর্বর ইয়োরোপে উদ্ভূত মার্কসবাদী তত্ত্বের মধ্য দিয়ে। পক্ষান্তরে ভারতকে জানার জন্য ভারতের নিজস্ব যে সমস্ত গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করা প্রয়োজন তাকে তাঁরা ভাববাদী গ্রন্থ নাম দিয়ে আফিমের মতই বর্জন করেছেন। তাই তাদের জানা কখনও সঠিক হয় না। এককালে তাঁরা জানতেন নেতাজী জাপানের চর, তোজোর কুকুর, আজ সে জানা পালটে গিয়েছে। কাজেই এই সব স্বল্পশিক্ষিত ও অদূরদর্শী মার্কসবাদীর দল ভারতকেই বা জানবে কেমন করে আর তার সমস্যাকেই বা বুঝবে কেমন করে? সমস্যার সমাধান করা তো অনেক দূরের কথা। যে শ্রেণিসংগ্রামের মার্কসবাদী তত্ত্ব বর্বর, বস্তুনিষ্ঠ ও ভোগবাদী ইয়োরোপীয় সমাজের ফসল, তাকে তাঁরা মহানন্দে ভারতে আমদানী করেছেন, বৈজ্ঞানিক ও সার্বজনীন বলে তাকে ভারতের মাটিতে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছেন এবং প্রতিপদে ব্যর্থ হয়েছেন। কারণ সুসভ্য ভারতীয় সমাজ ঐ বিদেশী তত্ত্ব অনুযায়ী অতীতেও চলেনি, আর ভবিষ্যতেও চলবে না।

মূল সমস্যা হল, মুসলমানদের যেমন যে দেশে জন্মগ্রহণ করেছে, যে দেশে বসবাস করছে, সেই মাতৃভূমির প্রতি কোন আনুগত্য ও শ্রদ্ধা থাকে না, তাদের সমস্ত শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রবাহিত হয় শুষ্ক মরুময় আরবের প্রতি, মক্কা-মদিনার প্রতি, তেমনি আমাদের দেশদ্রোহী

মার্কসবাদীদেরও ভারতের প্রতি, তাদের মাতৃভূমির প্রতি কোনো আনুগত্য ও শ্রদ্ধা নেই। এককালে তাদের সমস্ত আনুগত্য ছিল রাশিয়া তথা মস্কোর প্রতি এবং আজ চিন তথা বেজিং সে স্থান দখল করেছে। তাই চিন পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটালে আমাদের মার্কসবাদীরা পুলকিত হন। কিন্তু নিজের দেশ ভারত তা করলে এই মীর্জাফরের দল তাকে নিন্দা করে। চিন দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করলে এই সব ঘৃণ্য ব্যক্তিরা আনন্দিত হন, কিন্তু সেই পরীক্ষা ভারত করলে তাকে টাকা পয়সার অপব্যয় বলেন এবং এর দ্বারা গরিব মানুষের ডাল-রুটির যোগাড়ে কোনো সুবিধে হবে না বলে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করেন।

তাই এ কথা জোর দিয়ে অস্বীকার করা যায় না, ভবিষ্যতে যদি চিন ভারত আক্রমণ করে তবে এই মার্কসবাদীর দল ভারতের বিরুদ্ধে চিনের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করবে না। এ প্রসঙ্গে পাঠকের হয়তো স্মরণ থাকতে পারে যে, ১৯৬২ সালে চিন ভারত আক্রমণ করলে দেশদ্রোহী মার্কসবাদীরা ভারতকেই আক্রমণকারী বলে দোষারোপ করেছিল এবং '৭০-এর দশকে নক্‌শাল আমলে ঐ নক্‌শালবাদীরা আওয়াজ তুলেছিল—চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান। এককালের ভারত আক্রমণকারী দস্যু মহম্মদ ঘোরীর নামে আজ পাকিস্তান তার সব থেকে দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের নাম 'ঘাউরি'' রেখেছে এবং তাতেই ক্ষান্ত থেকেছে। কিন্তু নক্‌শালদের যে মনোভাব উল্লিখিত স্লোগানের মধ্য গিয়ে প্রকাশ পেয়েছে তাতে অনুমান করা চলে যে তারা কোনো এক চিনা ব্যক্তিকে ভারতে এনে ভারতের সর্বোচ্চ পদে বসাতেও কুণ্ঠিত হবে না।

হিন্দুত্ব ভারতের জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি ঃ

আজ থেকে প্রায় বছর পাঁচেক আগে এই বিতর্ক চরমে ওঠে যে, মহারাষ্ট্রের কোনো একটি রাজনৈতিক দল হিন্দুত্বের কথা বলে বা বিশেষ একটি ধর্মের আবেদন সামনে রেখে জনসাধারণের ভোট প্রার্থনা করে খুবই সাম্প্রদায়িক কাজ করেছে এবং সেই কারণে ভোট বাতিল করা উচিত। বিবাদ শেষ পর্যন্ত সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত যায়। বিগত ১৯৯৫ সালের ১১ ডিসেম্বর সুপ্রীম কোর্টের তিনজন বিচারপতিকে নিয়ে গঠিত বিশেষ বেঞ্চ সেই মামলার ঐতিহাসিক রায়ে এই মত ব্যক্ত করে যে, হিন্দু শব্দের দ্বারা ইসলাম বা খ্রিস্টধর্মের মত বিশেষ কোনো ধর্মমতকে বোঝায় না। হিন্দু শব্দের অর্থ আরও ব্যাপক এবং প্রকৃতপক্ষে হিন্দুত্বের দ্বারা একটি বিশেষ সভ্যতা বা সংস্কৃতিকে বোঝায়, যা বিগত হাজার হাজার বছর ধরে এই ভারতবর্ষে চলে আসছে। কাজেই হিন্দুত্বের কথা বলে ভোট চাওয়া কোনো মতেই সাম্প্রদায়িক কাজ নয়। এখানে আরও লক্ষণীয় ব্যাপার হল এই যে, উপরিউক্ত কারণের জন্যই প্রাচীন ভারতীয় যে কোনো বিদ্যাচর্চার শাখাকে পণ্ডিতরা হিন্দু নামে অভিহিত করেন—যেমন, হিন্দু গণিত, হিন্দু জ্যোতিষ, হিন্দু অর্থনীতি ইত্যাদি। বেশি দূরে যাবার প্রয়োজন নেই। এই রীতি অনুসরণ করেই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর রচিত প্রাচীন ভারতীয় রসায়নের নাম ''হিন্দু রসায়নের ইতিহাস'' রেখেছেন।

কিন্তু শ্রীমোহন দাস গান্ধী ও শ্রীজহরলাল নেহেরু এই ভারতে বিচিত্র এক সেকুলার তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করে গেছেন যার মতে হিন্দু নামাঙ্কিত যে কোনো গ্রন্থ, পুস্তক, বক্তৃতা, কথাবার্তা সবই সাম্প্রদায়িক বলে নিন্দিত হচ্ছে। উল্লিখিত সুপ্রীম কোর্টের রায়ের মধ্য দিয়ে গালে এক প্রচণ্ড থাপ্পড় খাওয়া সত্ত্বেও সেকুলারবাদীবা তাদের সেই বিচিত্র সেকুলারবাদ আজও অনুকরণ করে

চলেছে। আমাদের মার্কসবাদীরা এই সেকুলার তত্ত্বের এক প্রবল সমর্থক এবং দারুণভাবে সেকুলারবাদী। তবে এই সেকুলারবাদের হীন উদ্দেশ্য যে মুসলমান তোষণ তা আর দেশের মানুষের জানতে বাকি নেই। এই সেকুলারবাদী মুসলীম তোষণের নীতি গ্রহণ করেই পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মার্কসবাদী সরকার বাংলাদেশীদের অনুপ্রবেশে সাহায্য করছে।

এই প্রসঙ্গে সেকুলারবাদী ঐতিহাসিকরা ভারতের ইতিহাসে কি পরিমাণ বিকৃতি সাধন করে সমূহ ক্ষতি করে চলেছেন তার কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া চলে। এঁরা প্রচার করছেন যে ভারতে মুসলমান শাসনের যুগ পরাধীনতার যুগ তো নয়ই, বরং সুবর্ণ যুগ। অত্যাচারী, লম্পট ও নিষ্ঠুর আকবরকে তাঁরা মহান সম্রাট অশোকের সমান আসনে বসিয়েছেন। তাঁদের মতে আকবর রাজস্থান জয় করে সমস্ত ভারতকে এক ঐক্য বন্ধনে বাঁধার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু হীনমতি রাণা প্রতাপ আকবরের সেই মহান প্রচেষ্টায় জল ঢেলে দিয়েছেন। তেমনি মহান সম্রাট ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্য জয় করে ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ক্ষুদ্রবুদ্ধি রাজা শিবাজী সেই মহান প্রচেষ্টায় বাধা দিয়েছেন। এঁদের মতে বিদেশী অত্যাচারী, লম্পট মুসলমান শাসকরা সকলেই ছিল মহান ও উদার এবং বদমাস হিন্দুগুলোই নানারকম সমস্যার সৃষ্টি করেছে। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের মতে এই সব মুসলমান দস্যুরা তাদের ৭০০ বছরের শাসনকালে এত ব্যাপক হিন্দুহত্যা করেছে যে, হিন্দুর সংখ্যা ৬০ কোটি থেকে কমে ২০ কোটি হয়েছে। (বিশদ বিবরণের জন্য বর্তমান লেখকের "মিথ্যার আবরণে দিল্লি আগ্রা ফতেপুর সিক্রি" দ্রষ্টব্য।)

দেশদ্রোহী মার্কসবাদীরা ইতিহাসকে কতখানি বিকৃত করতে পারে তা পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মার্কসবাদী সরকার দ্বারা প্রকাশিত যে কোনো স্কুলপাঠ্য ইতিহাসের বই পড়লেই পাঠক পরিষ্কার বুঝতে পারবেন। এই সব পুস্তকে নেতাজীর বিষয়ে দু'লাইনে লেখা হয়, কিন্তু তিতুমীরের বিষয়ে দু'পৃষ্ঠা লেখা হয় এবং ভিয়েতনাম ও চিনের মার্কসবাদী বিপ্লবের বিষয়ে পৃথক অধ্যায় রচিত হয়। এ ব্যাপারে এটাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, সেকুলার ঐতিহাসিকদের যে গোষ্ঠী ভারতের ইতিহাসকে বিকৃত করে চলেছেন, তাঁদের মধ্যে মার্কসবাদী দেশদ্রোহীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং প্রকৃতপক্ষে তাঁরাই এটা নিয়ন্ত্রণ করছেন (এ বিষয়ে বিশদ বিবরণের জন্য পাঠক অরুণ শৌরি মহাশয়ের "Eminent Historians" এবং শ্রীপুরুষোত্তম নাগেশ ওক মহাশয়ের "Islamic Havoc in Indian History" দেখতে পারেন।)

প্রকৃতপক্ষে যে হিন্দুত্ব বর্তমানে সেকুলারবাদী ঐতিহাসিকদের কাছে সর্বাপেক্ষা ঘৃণার বস্তু, সেই হিন্দুত্বই ভারতের জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি। কবি বলেছেন, "নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান।" কবি এখানে আরও একটা বিষয় বাদ দিয়েছেন, তা হল খাদ্যাভ্যাস। রাজস্থানের জোয়ারের রুটি বাঙালির পেটে সহ্য হবে না। তেমনি দক্ষিণ ভারতের ইড্‌লি, দোসা, সম্বর, রসম উত্তর ভারতের মুখে রুচিকর মনে হবে না। কিন্তু এই সব বিবিধের মাঝে মিলনের সূত্রটা কি? কি সেই অদৃশ্য বন্ধন যা এত বিভিন্নতা সত্ত্বেও ভারতের জনসাধারণকে এক নিবিড় ঐক্য বন্ধনে বেঁধে রেখেছে? তা হল গঙ্গা, গায়ত্রী, গীতা ও গোবিন্দ, এই চার গ'র ঐতিহ্য।

আমাদের মনীষীদের মতে হিন্দু সংস্কৃতি বা হিন্দুধর্ম বা হিন্দুত্বই হল সেই ঐক্যের মূল ভিত্তিভূমি। হিন্দুত্বই হল ভারতের জাতীয়তাবাদ। তাই শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, "I say that is the Sanatana Dharma which is for us our nationalism. This Hindu nation was born with the Sanatana Dharma, with it moves and with it it grows." অর্থাৎ,

"সনাতন ধর্ম বা হিন্দু ধর্মই হল আমাদের জাতীয়তাবাদ। এই হিন্দু জাতি সনাতন ধর্ম সাথে নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে, এবং সনাতন ধর্মকে সাথে নিয়েই সে অগ্রসর হচ্ছে এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে" (উত্তরপাড়া অভিভাষণ)।

কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর "আত্মপরিচয়" প্রবন্ধে লিখছেন, "বর্তমানকালে আমরা কেহ কেহ এই লইয়া চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছি, আমরা যে কী, সে লইয়া আমাদের মনে একটা সন্দেহ জন্মিয়াছে। আমরা আর কিছুই নই, আমরা ব্রাহ্ম। কিন্তু সে তো একটা নূতন পরিচয় হইল। সে পরিচয়ের শিকড় তো বেশিদূর যায় না?....ইহার চেয়ে পাকা পরিচয়ের ভিত্তি কি আমার কিছুই নাই? অতীতকাল হইতে প্রবাহিত একটা নিত্য লক্ষণ কি আমার মধ্যে একেবারেই বর্তায় নাই?...অতএব আমি হিন্দু, এ কথা বলিতে যদি নিতান্তই কোন লজ্জার কারণ থাকে, তবে সে লজ্জা আমাকে নিঃশব্দে হজম করিতে হইবে।" কবি আরও লিখছেন, "তবে কি মুসলমান ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ে যোগ দিলেও তুমি হিন্দু থাকিতে পার? নিশ্চয়ই পারি। ইহার মধ্যে পারাপারির তর্কমাত্রই নাই। ...ইহা সত্য যে কালীচরণ বাঁড়ুজ্জে মহাশয় হিন্দু-খ্রিস্টান ছিলেন, তাহার পূর্বে জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় হিন্দু-খ্রিস্টান ছিলেন, তাঁহার পূর্বে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দু-খ্রীষ্টান ছিলেন। অর্থাৎ তাঁহারা জাতিতে হিন্দু, ধর্মে খ্রিস্টান ছিলেন। খ্রিস্টান তাহাদের রঙ, হিন্দুই তাহাদের বস্তু। বাংলাদেশে হাজার হাজার মুসলমান আছে, হিন্দুরা তাহাদের অহর্নিশি "হিন্দু নও, হিন্দু নও" বলিয়াছে এবং তাহারাও নিজদিগকে "হিন্দু নই, হিন্দু নই" শুনাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু তৎ সত্ত্বেও তাহারা প্রকৃতই হিন্দু-মুসলমান।....মুসলমান একটি বিশেষ ধর্ম, কিন্তু হিন্দু কোন বিশেষ ধর্ম নহে, ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক জাতিগত পরিণাম।"

গীতা বলছে, "**যদ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ**" (৩/২১), অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা যাহা আচরণ করেন, অপর সাধারণেও তাহাই করে।" কাজেই প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে, ভারতের আপামর জনসাধারণ কোন্ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে অনুসরণ করবে? ভারতবর্ষের মানুষ কি এই ভারতেরই সন্তান, সত্যদ্রষ্টা ঋষি অরবিন্দ বা শ্রীরবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করবে, না কি জার্মানিতে জন্মগ্রহণকারী এবং ভারত সম্পর্কে নিতান্ত অজ্ঞ মার্কসকে অনুসরণ করবে? ভারতবর্ষের মানুষ কি মার্কসের কথামত হিন্দুত্বকে আফিমের মত বর্জন করবে, না রবীন্দ্রনাথ ও অরবিন্দের কথামত হিন্দুত্বকে জাতির মূল জীবনীশক্তি হিসাবে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে থাকবে? বিবেকানন্দও এ ব্যাপারে জাতিকে সতর্ক করে দিয়ে বলে গেছেন, "তোমরা যদি ধর্ম ছাড়িয়া পাশ্চাত্য জাতির জড়বাদ-সর্বস্ব সভ্যতার অভিমুখে ধাবিত হও, তোমরা তিন পুরুষ যাইতে না যাইতেই বিনষ্ট হইবে। ধর্ম ছাড়িয়া দিলে হিন্দুর জাতীয় মেরুদণ্ডই ভাঙ্গিয়া যাইবে। ফল দাঁড়াইবে সম্পূর্ণ ধ্বংস।" (বিবেঃ রচঃ, উদ্বোধন, জন্মশতবর্ষ সং, ৫ম খণ্ড, পৃঃ-৬৮।)

কিন্তু দেশের প্রতি শ্রদ্ধাহীন, জাতির প্রতি শ্রদ্ধাহীন, সর্বোপরি নিজের দেশের মহাপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধাহীন দেশদ্রোহী মার্কসবাদীরা সত্যদ্রষ্টা দেশের মহামানবদের কথা বা উপদেশকে কোনো গুরুত্ব না দিয়ে ভারতবর্ষ সম্পর্কে অজ্ঞ, বিদেশী ও জড়বাদী মার্কসের বাণীকেই অভ্রান্ত বলে মেনে নিল এবং হিন্দুত্বকে আফিমের মতই বর্জন করল। হিন্দুত্বকে অস্বীকার করে তারা জাতীয় ঐক্যের মূল ভিত্তিকেই অস্বীকার করল। বিবেকানন্দের ভাষায়, জাতির মেরুদণ্ডকেই অস্বীকার করল। ফল দাঁড়াল ভারত সম্পর্কে মার্কসবাদীদের সীমাহীন অজ্ঞতা। এই কারণেই স্বাধীনতার প্রাক্কালে তারা বলতে পেরেছিল যে, ভারতে ষোলটি জাতি বাস করে এবং তাদের

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে মেনে নিয়ে ভারতবর্ষকে ষোল টুকরো করা উচিত। এই ঘটনা এটাও প্রমাণ করে যে, অন্ধের মত কোনো বিদেশী তত্ত্বকে ভারতে প্রয়োগ করার ফল কত মারাত্মক ও বিপজ্জনক হতে পারে। পাকিস্তান সৃষ্টিতে মার্কসবাদীদের সমর্থন এই বিপজ্জনক পরিণতিরই সাক্ষ্য বহন করছে।

শ্রীঅরবিন্দের অসীম প্রজ্ঞা ও গভীর অনুভূতি যে সত্য উচ্চারণ করেছিল, সেই সত্য ক্রমশই উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। হিন্দুত্বই যে ভারতীয়ত্ব বা ভারতের জাতীয়তাবাদ তা নানান ঘটনার মধ্য দিয়ে আজ চরম সত্য বলে প্রতিভাত হচ্ছে। ভারতের যে অংশে হিন্দুর সংখ্যা কমে যাচ্ছে সেখানেই বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাচ্ছে। হিন্দুর সংখ্যা কমে যাবার ফলে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান ভারত থেকে পৃথক হয়ে পৃথক রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, মেঘালয় ইত্যাদি উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে হিন্দুর সংখ্যা কমে গিয়ে খ্রীষ্টানদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় সেখানেও বিচ্ছিন্নতাবাদী দাবি উঠছে এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ বেড়ে চলেছে। তাই এটাও দিনের আলোর মত পরিষ্কার হচ্ছে যে, হিন্দুত্বের প্রসার ভিন্ন আর কোনো মতেই ভারতের ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষা করা সম্ভব নয়।

ধর্ম শব্দের তাৎপর্য ঃ

গীতা বলছে, "প্রকৃত তত্ত্ব না বুঝিয়া, 'ইহাই যাহা কিছু সমস্ত' এইরূপ কোন একটি খণ্ডিত বিষয়ে আসক্ত থাকাকে, সেই যুক্তি-বিরুদ্ধ, অ-যথার্থ ও তুচ্ছ জ্ঞানকে তামসিক জ্ঞান বলে।" (১৮/২২)। কাজেই গীতা অনুসারে ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের মার্কসবাদীদের জ্ঞান অ-যথার্থ ও তামসিক। ধর্ম শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য না বুঝে তাঁরা একে বিলাতী রিলিজিয়ন শব্দে সমার্থক ধরে নিয়েছেন এবং তাদের এই জ্ঞানকেই সম্পূর্ণ ভাবছেন। এ ছাড়া আর কিছু জানার বা বোঝার নেই। কাজেই হিন্দুধর্মও পাশ্চাত্যের খ্রীষ্টধর্ম বা আরবের ইসলামের মতই একটা রিলিজিয়ন মাত্র। তাই গীতানুসারে তাদের এই জ্ঞানও অ-যথার্থ ও তামসিক জ্ঞান। সব থেকে বড় কথা হল, তাদের এই ভুল ভাবনার জন্য সত্য পরিবর্তিত হবে না, ধর্ম আর রিলিজিয়ন সমান হয়ে যাবে না। এবং হিন্দুধর্ম বা সনাতন ধর্ম খ্রীষ্ট মত বা ইসলামের সঙ্গে সমান হয়ে যাবে না। পক্ষান্তরে এই ভুল ধারণা বশত মার্কসবাদীরা যে ভুল পদক্ষেপ নিয়েছেন তাতে তাদের শ্মশানযাত্রার পথই প্রশস্ত হচ্ছে এবং হবে।

ভারতীয় চিন্তাধারা অনুযায়ী প্রতিটি মানুষ শরীর, মন, বুদ্ধি ও আত্মার সমষ্টি, কিন্তু এগুলি একাত্মীভূত এবং একটিকে পৃথক করে চিন্তা করা যায় না। কাজেই মানুষের জীবন প্রণালী ও সমাজ ব্যবস্থাও এমন হওয়া উচিত যাতে এই চারটিরই পুরিপুষ্টি ঘটে, সন্তুষ্টি ঘটে এবং উন্নতি সাধিত হয়। এগুলি বিকশিত হলেই মানুষ পূর্ণরূপে বিকশিত হয়। তাই ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারটি পুরুষার্থের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিজীবন নির্ধারিত করে দিয়েছে যাতে শরীর, মন, বুদ্ধি ও আত্মার পরিপুষ্টি ঘটতে পারে। পুরুষার্থ হল মানবীয় প্রয়াস বা প্রচেষ্টা। এখানে লক্ষণীয় হল এই যে, মার্কসবাদ মানুষের শরীর, মন ও বুদ্ধির পরিপুষ্টির ব্যবস্থা করেছে এবং আত্মা অবহেলিত হয়েছে। মার্কসবাদ অনুসারে মানুষ হল একটা বৈজ্ঞানিক যন্ত্র এবং ভাবা হয়েছিল যে, আহার, নিদ্রা, বাসস্থান আর মৈথুনের ব্যবস্থা করতে পারলেই মানুষ সুখে থাকবে। এই কারণেই মার্কসবাদকে বলা যায় একটি শিশ্নোদর তত্ত্ব এবং এতে

আত্মার তৃপ্তির ব্যবস্থা না থাকাতে ১০০ বছর যেতে না যেতেই তা পৃথিবীর মাটি থেকে উৎখাত হতে চলেছে। মানুষ পশু নয়, তাই মার্কসবাদকে মানুষ পরিত্যাগ করেছে।

যাই হোক, এবার ধর্মের কথায় আসা যেতে পারে। উপরিউক্ত চার পুরুষার্থের মধ্যে একমাত্র অর্থের স্থান মানুষের বাইরে। জগতে যা কিছু ভোগের সামগ্রী আছে তা সবই অর্থের মধ্যে পড়ে। টাকা-পয়সা বা ধনের বিনিময়ে এই সমস্ত ভোগের সামগ্রীর উপর অধিকার অর্জন করা যায় বলে সাধারণভাবে অর্থ বলতে টাকা-পয়সা বা ধন বোঝায়। পরবর্তী পুরুষার্থ 'কাম'-এর স্থান হল মানুষের মনে। কাম বলতে বোঝায় মানুষের স্বাভাবিক ইচ্ছা বা কামনার পরিপূর্তি। ইন্দ্রিয়গণ হল কাম পুরুষার্থ চরিতার্থ করার সহায়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক, এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়; পায়ু, উপস্থ, হস্ত, পদ ও বাক্য, এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় এবং মন হল একাদশ ইন্দ্রিয়। এই ইন্দ্রিয়গণ হল **"ধেনুবৎ বৎসায়"** অর্থাৎ গাভী যেমন তার বাছুরের দ্বারা আকৃষ্ট হয়, ইন্দ্রিয়গণও সেই রকম কামের দ্বারা আকৃষ্ট হয়। ইন্দ্রিয়গণের দ্বারাই মানুষের মনে কামের উদয় হয়, আবার ইন্দ্রিয়গণের দ্বারাই সে কামের পরিতৃপ্তি হয়। যেমন ভাল খাবারের গন্ধ নাকে গেলে খাবার লোভ জন্মায় এবং খেলে জিহ্বা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সে কাম তৃপ্ত হয়।

সব মানুষের পক্ষে কাম জয় করে নিষ্কাম হওয়া সম্ভব নয়। আবার সর্বক্ষণ কামের প্রতি ধাবমান হওয়াও সঙ্গত নয়। তাই নিয়ন্ত্রিত কামই সাধারণ মানুষের পথ এবং এখানেই ধর্মের -এর আবির্ভাব। ধর্ম পুরুষার্থের দ্বারা কামকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ধর্মের উৎপত্তি হয় মানুষের বুদ্ধি থেকে—বিশেষভাবে ভাল-মন্দ বা সৎ-অসতের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে মানুষ সমর্থ হয় বুদ্ধি থেকে। কামের প্রতি উদ্‌ভ্রান্তের মত ধাবিত হওয়া থেকে বুদ্ধি বা ধর্ম মানুষকে রক্ষা করে। রশ্মি (বল্গার দড়ি) যেমন অশ্বকে এবং অঙ্কুশ যেমন হাতীকে নিয়ন্ত্রিত করে, ধর্ম তেমনি মানুষকে নিয়ন্ত্রিত করে। কাজেই ধর্মহীন মানুষ বল্গাহীন রথের মতই উদ্দেশ্যভ্রষ্ট হয়ে কামের প্রতি উদ্দাম গতিতে ছুটে শেষ পর্যন্ত কোনো খানা-ডোবায় হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তে বাধ্য। এ থেকে এটাই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ভারতীয় সংস্কৃতিতে ধর্ম শব্দের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক এবং তা শুধু মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়া বা গীর্জায় গিয়ে উপাসনা করার মত কতকগুলি বাহ্যিক ক্রিয়া সম্পাদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

অন্য দিক থেকে বিচার করলে বলা যায় যে, সমাজের প্রতিটি মানুষ যদি কোনো নিয়ন্ত্রণ না মেনে উদ্দাম গতিতে কামের পিছনে ছুটতে থাকে তাহলে মনুষ্য সমাজ আর সুসভ্য সমাজ থাকবে না, অরণ্যের সমাজে পরিণত হবে। কাজেই ধর্ম বলতে উদ্দাম কাম নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে সৃষ্ট সমুদায় সামাজিক বিধি-নিয়মকে বোঝায়। অর্থাৎ ধর্ম হল সমাজ থেকে উদ্ভূত একটি স্বাভাবিক নিয়ম-কানুনের সমষ্টি যা একটা সভ্য সমাজ রক্ষার জন্য প্রয়োজন। এই কারণে অনেকে সংস্কৃত ধর্ম শব্দের প্রতিশব্দ করেছেন "innate law" অথবা "moral value" এবং আমাদের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ ধর্মের প্রতিশব্দ করেছেন "Virtue"। এই কারণেই সংস্কৃত ধৃ ধাতু থেকে ধর্ম শব্দের উৎপত্তি যার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল—যাহা ধারণ করে। বিশেষ অর্থে—যা সমাজকে ধারণ করে। তাই মহাভারতের শান্তি পর্বে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলছেন, **পুরাকালে রাজাও ছিল না, রাজ্যও ছিল না; দণ্ড ছিল না, দণ্ডার্হ ব্যক্তিও ছিল না। তখন প্রজারা ধর্মানুসারে পরস্পরকে রক্ষা করত।**

পাশ্চাত্য মতে মানুষ এবং তার ব্যক্তি স্বাধীনতা সকলের উপরে। এই কারণে আজ ইয়োরোপের অনেক দেশে ড্রাগ খাওয়া আইনত অপরাধ নয়, এবং প্রায় সব শহরগুলিতে

ড্রাগের কাফে গজিয়ে উঠেছে যেখানে যে কেউ পয়সা দিয়ে ড্রাগ খেতে পারে। এই কারণেই পাশ্চাত্যে আজ সমকামীদের (বিশেষ করে দুই সমকামী পুরুষের মধ্যে) বিবাহ আইনত সিদ্ধ। এই কারণেই আমেরিকায় যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো দোকান থেকে যে কোনো রকমের আগ্নেয়াস্ত্র কিনতে পারে, কোনো লাইসেন্সের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু ভারতীয় মতে সমাজের স্বার্থ সকলের উপরে এবং তারপরে ব্যক্তিস্বার্থ বা ব্যক্তিস্বাধীনতা। যে ব্যক্তিস্বাধীনতা সমষ্টির ক্ষতি সাধন করে সে ব্যক্তিস্বাধীনতা ভারতে স্বীকৃত নয়। তাই সমাজের পক্ষে শুভ ও মঙ্গলজনক বলে যে সমস্ত নিয়ম-নীতি ধর্মের স্বীকৃতি লাভ করেছে, হিন্দু সংস্কৃতিতে তার স্থান সকলের উপরে। রাজা তো বটেই, এমন কি ঈশ্বরও ধর্মের অধীন। ধর্মকে অতিক্রম করার সাধ্য কারও নেই। হিন্দু মতে যে কোনো প্রাণীপীড়ন অধর্ম। পরের অনিষ্ট চিন্তা অধর্ম। শঠতা ও বঞ্চনাহীন বৃত্তি গ্রহণ করাই ধর্ম। শুধু প্রাণ রক্ষার জন্য ধন উপার্জন করাই ধর্ম, বেশি ধনের চেষ্টা করা অধর্ম। আহার, নিদ্রা ও মৈথুন মানুষ ও পশু উভয়ের মধ্যেই বিদ্যমান কিন্তু ধর্মই মানুষকে পশু থেকে পৃথক করেছে। তাই ধর্মহীন মানুষ পশুমাত্র, ধর্মহীন সমাজ পশুর সমাজ, অরাজক মাৎস্যন্যায়ের সমাজ।

উপরিউক্ত ধর্ম সম্বন্ধে মনুসংহিতা বলছে,

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোহস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্।।

—অর্থাৎ ধৃতি (সন্তোষ), ক্ষমা, দম (বিষয় সংসর্গে মনের অবিকার), অস্তেয় (চুরি না করা), শৌচ (দেহশুদ্ধি), ইন্দ্রিয়সংযম, ধী (সংশয় বিলোপকারী সম্যক বুদ্ধি), বিদ্যা (আকিঞ্চন), সত্য ও অক্রোধ, এই দশটি ধর্মের লক্ষণ। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ধর্মপথে চলেন তাঁর মধ্যে এ-সকল গুণ বিকশিত হয়। ধর্মের এই ব্যাখ্যার মধ্যে মানবিকতার চূড়ান্ত উৎকর্ষের কথাই বলা হয়েছে। এ ধর্ম সমগ্র মানবজাতির জন্য, বিশেষ কোনো মানবগোষ্ঠীর জন্য নয়। স্বামীজি বলেছেন, "যাহাই মানুষকে উন্নত করে তাহার নাম ধর্ম। পশুত্বকে দূর করিতে হইবে, মানবত্বকে দেবত্বে লইয়া যাইতে হইবে।" এই পৃথিবীতে একমাত্র হিন্দুই বিশ্বাস করে যে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই দেবত্ব লুকিয়ে আছে এবং সাধনার দ্বারা মানুষ নিজেকে সেই দেবত্বে উন্নীত করতে সক্ষম। ধর্ম হল সেই সাধনার পথ। ধর্মই মানুষকে, মানবত্বকে অতিক্রম করে দেবত্বে পৌঁছে দেয়।

পাশ্চাত্যের রিলিজিয়ন ঃ

পাশ্চাত্যের খ্রিস্টধর্ম ও আরবের ইসলাম রিলিজিয়নের প্রকৃত উদাহরণ। এদের তুলনা করা চলে আজকের বড় বড় বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর সঙ্গে। এই সব কোম্পানিগুলো যেমন বলছে, একমাত্র তাদের তৈরি সাবানেই জামা-কাপড় পরিষ্কার হবে বা তাদের তৈরি দাঁতের মাজনেই দাঁত পরিষ্কার হবে, অন্য সব কোম্পানির সাবান বা মাজন সব বাজে মাল। এই রিলিজিয়ন দুটিও দিনরাত ওই একই কথা বলে চলেছে। বিক্রির জন্য তারা তাদের উপাসনা পদ্ধতির মতবাদকে হাজির করে বলছে যে, একমাত্র তাদের মতকে অনুসরণ করলেই পরিত্রাণ পাওয়া যাবে, স্বর্গলাভ হবে। অন্য কোনো মত অবলম্বন করে স্বর্গে যাওয়া অসম্ভব। উপরন্তু তারা আরও বলছে যে, তারা যে ঈশ্বরের ভজনা করে সে-ই একমাত্র খাঁটি ঈশ্বর এবং অন্যান্য লোকেরা যে ঈশ্বরের ভজনা করে তা মেকী ঈশ্বর। তারা যে পথ অনুসরণ করে চলেছে

সেটাই একমাত্র খাঁটি পথ এবং বাদবাকি সবাই যে পথ অনুসরণ করে চলেছে সে সবই মেকী পথ। এ থেকে তাদের সিদ্ধান্ত হল, প্রথমত যে সমস্ত লোক সেই মেকী পথ অনুসরণ করে মেকী ঈশ্বরের ভজনা করে চলেছে তারা ঘৃণ্য ও বধযোগ্য। দ্বিতীয়ত, সেই মেকী ঈশ্বরের ভজনাকারী বিধর্মী লোকেদের ধর্মান্তরিত করে খাঁটি ঈশ্বরের পথে নিয়ে আসতে হবে। সোজা কথায় না হলে বলপ্রয়োগ ও রক্তপাত ঘটিয়েও তা করতে হবে। তৃতীয়ত মেকী ঈশ্বর ও মেকী পথ সম্পর্কিত যে সব গ্রন্থাদি আছে তার থেকে কিছুই শিক্ষণীয় নেই। ঐ সব গ্রন্থ জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিলেও কিছু যায় আসে না।

তাই খ্রিস্টমত বলছে, যে যীশুর শরণাপন্ন না হবে তার পরিত্রাণ নেই (2 Timothy-3) যে খ্রিস্টকে অনুসরণ করবে একমাত্র সেই পরিত্রাণ পাবে (2 Peter-3/13)। অ-খ্রিস্টানদের উপর ঈশ্বরের ক্রোধ বর্ষিত হবে (Hebrews-3/11)। অ-খ্রিস্টানরা বন্য পশু (2 Peter-2/12), ওদের ঘরে ঢুকতে দিও না (2 John-10), ওদের সঙ্গে বন্ধুত্ব কোরো না (2 Corinthian-6/14), ওদের কাছ থেকে কিছু গ্রহণ কোরো না (3 John-7) এবং ওরা হল ঈশ্বরহীন পশু (Jude-4)। খ্রিস্টকে অনুসরণকারীরা হল ঈশ্বরের নির্বাচিত প্রিয়পাত্র (Colossians-3/12, Peter-1/1, 2/9, 2/18; Thessalonians-1/4; Titus-1/1 ইত্যাদি)। অ-খ্রিস্টানরা সকলেই নরকের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে (2 Thessalonians-1/8,9)।

ঠিক একই ভাবে ইসলাম বলছে, যারা কোরান ও মহম্মদের নবীত্বে বিশ্বাস করে না তারা কাফের এবং পশুর সমান (কোরান-৭;১৭৯)। এরা সবাই নরকে যাবে (ঐ ৩/৮৫) এবং এদের সঙ্গে বন্ধুত্ব কোরো না (ঐ ৫/৫৭)। আল্লা এদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন (ঐ ৪/১৪৭, ৪/১৪৮, ৮/১০-১৪)। এরা নিষ্ঠুরভাবে বধযোগ্য (ঐ ৩৯/৩০-৩২)। এদের যেখানে পাবে বন্দী করবে এবং হত্যা করবে (ঐ ৪/৮৯, ৪/৯১, ২/১৯১)। এদের সঙ্গে অবিরাম যুদ্ধ করো, গর্দানে আঘাত করো (ঐ ৮/৩৯, ৪৭/৪)। ওদের শূলবিদ্ধ করো অথবা হাত-পা কেটে দাও (ঐ ৫/৩৩)।

বিধর্মী কাফেরদের প্রতি আল্লা কতখানি নৃশংস হতে পারেন, দু একটা উদাহরণ দিলে তা ভালো বোঝা যাবে। কোরানের ৯ম সুরায় ৫ম আয়াতে আল্লা বলেছেন—অতঃপর নিষিদ্ধ মাসমসূহ শেষ হলে অংশীবাদী কাফেরদের যেখানে পাবে বধ করবে এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওৎ পেতে থাকবে। কিন্তু যদি তারা তওবা (অনুতাপ) করে, নামাজ কায়েম করে ও জাকাত দেয় তবে তাদের মুক্ত করে দেবে। ৪র্থ সুরার ৫৬শ আয়াতে আল্লা বলছেন—যারা আমার আয়াতে বিশ্বাস না করে তাদের আমি অবশ্যই জ্বলন্ত আগুনে দগ্ধ করবো এবং প্রত্যেকবার দগ্ধ করার পর নতুন চামড়ার সৃষ্টি করবো, যাতে তারা নিরন্তর শাস্তি ভোগ করতে পারে। ৫ম সুরার ৩৩শ আয়াতে আল্লা বলছেন—যারা আল্লা ও তার রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে পৃথিবীতে অশান্তি উৎপাদন করে, নিশ্চয়ই তাদের শাস্তি হল এই যে, তাদের হত্যা করো, কিংবা শূলবিদ্ধ করো, কিংবা তাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেল, কিংবা তাদের দেশ থেকে থেকে বহিষ্কার করো।

উপরিউক্ত বাণীগুলো থেকে দুটো সিদ্ধান্ত করা চলে। প্রথমত, এই রিলিজিয়নগুলো হল মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টিকারী এক ধরনের তত্ত্ব। সমগ্র মানবসমাজকে এরা বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী—এই দুই শিবিরে ভাগ করে। এগুলো একপ্রকার ঘৃণার তত্ত্ব। এদের ঈশ্বরও অন্য

ধর্মাবলম্বী বা অবিশ্বাসীদের প্রচণ্ডভাবে ঘৃণা করে থাকেন এবং অনন্ত নরকের আগুনে নিক্ষেপ করেন। তাই এদের ঈশ্বর শুধু বিশ্বাসীদের প্রতিই করুণাময় ভগবান এবং অবিশ্বাসীদের কাছে ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ দানব বা জল্লাদ বিশেষ। কিন্তু হিন্দুর ভগবান বলেন—সকলেই আমার কাছে সমান এবং কেউ আমার প্রিয়ও নয়, কেউ আমার বিদ্বেষভাজনও নয় (গীতা—৯/২৮)। অথবা যে আমাকে যেমনভাবে ভজনা করে, আমি তাকে সেই ভাবেই সন্তুষ্ট করে থাকি (ঐ—৯/২৩)।

দ্বিতীয়ত, এই রিলিজিয়নগুলোকে তুলনা করা চলে আজকের রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে এবং সেই হিসাবে রিলিজিয়নগুলোও এক ধরনের রাজনৈতিক মতবাদ মাত্র। মানুষের নৈতিক চরিত্র কীভাবে উন্নত হবে, সাধনার দ্বারা আধ্যাত্মিক পথে সে কেমন করে অগ্রসর হবে ইত্যাদি ব্যাপারে এদের কোনো মাথাব্যথা নেই। এদের কথা হল শুধু আমার দলে যোগ দাও তাহলেই সব আপনি-আপনিই হয়ে যাবে, অনন্ত স্বর্গবাসের ব্যবস্থা পাকা হয়ে যাবে। আর আমার দলে যোগ না দিলে অনন্ত নরকের আগুনে পুড়ে মরতে হবে। এইভাবে লোভ দেখিয়ে দলের সদস্যসংখ্যা বাড়াতে হবে। ভালো কথায় কাজ না হলে নির্যাতন, হত্যা ও রক্তপাতের মধ্য দিয়েও সদস্যসংখ্যা বাড়িয়ে যেতে হবে এবং সদস্যসংখ্যা বাড়িয়ে শেষ পর্যন্ত ধর্মের নামে এক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ধর্মের নামে এইসব কার্যকলাপ এবং নিষ্ঠুরতা ও নৃশংসতাকে লক্ষ্য করে বিবেকানন্দ লিখছেন—খ্রিস্টধর্ম চিরকালই তরবারির জোরে প্রচারিত হয়েছে। কি আশ্চর্য, খ্রিস্টের মত নিরীহ মহাপুরুষের শিষ্যরা এত নরহত্যা করেছে। তলোয়ার ছাড়া খ্রিস্টধর্ম কোথায় সফল হয়েছে? ... আমি জানি, তোমাদের পূর্বপুরুষরা কি করে ধর্মান্তরিত হয়েছিল। তাদের সম্মুখে দুটি বিকল্প ছিল, হয় ধর্মান্তর গ্রহণ নয় মৃত্যু, এই তো?

স্বামীজি আরও লিখছেন,—মুসলমানরা এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা অপরিণত ও সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন। তাহাদের মূলমন্ত্র, আল্লা এক এবং মহম্মদই একমাত্র পয়গম্বর। যাহা কিছু ইহার বহির্ভূত সে সমস্ত কেবল খারাপই নহে, উপরন্তু সে সমস্তই তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করিতে হইবে; যে কোন পুরুষ বা নারী এই মতে সামান্য অবিশ্বাসী তাহাকে নিমেষেই হত্যা করিতে হইবে; যাহা কিছু এই উপাসনা-পদ্ধতির বহির্ভূত তাহাকেই অবিলম্বে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে, যে কোন গ্রন্থ অন্যরূপ মত প্রচার করিয়াছে সেগুলিকে দগ্ধ করিতে হইবে। প্রশান্ত মহাসাগর হইতে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত ব্যাপক এলাকায় দীর্ঘ পাঁচশত বৎসর ধরিয়া রক্তের বন্যা বহিয়া গিয়াছে। ইহাই মুসলমান ধর্ম (বিঃ রঃ ঐ, ৫/৪১৭, ৪/১২৫)।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ধর্ম এবং রিলিজিয়ন শব্দ দুটি কখনই সমার্থক হতে পারে না। উপরন্তু এটাও বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, হিন্দু বা সনাতন ধর্ম কোনো মতেই ইসলাম বা খ্রিস্টধর্মের সমতুল্য নয়। প্রথমত, হিন্দুধর্মে কোথাও বলা হয়নি যে, যারা হিন্দু নয় তাদের হত্যা করতে হবে বা তারা নরকে যাবে ইত্যাদি ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, হিন্দুধর্ম মানুষের মধ্যে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর বিভেদ সৃষ্টি করে না। হিন্দু এই বিশ্বের সকল মানুষকেই ঈশ্বরের সন্তান, অমৃতের পুত্র বলে বিশ্বাস করে। তাই হিন্দু যখন বলে যে, **"সর্বে সুখিনঃ সন্তু, সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ"** তখন সে বিশ্বের সকল মানুষের জন্যই সুখ-শান্তি ও আরোগ্য কামনা করে, বিশেষ কোনো মানবগোষ্ঠীর জন্য তা করে না। দ্বিতীয়ত, হিন্দু বলে না যে কাউকে ধর্মান্তরিত করে হিন্দু করতে হবে, বা ধর্মান্তরকরণের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্য বিস্তার করতে হবে। তৃতীয়ত, হিন্দু কখনও বলে না যে, আমি যে ঈশ্বর ভজনা করি সেই খাঁটি ঈশ্বর বা আমি যে পথ অনুসরণ করছি সেটাই শ্রেষ্ঠ পথ। পক্ষান্তরে উদার হিন্দু বলে যে, বিশ্বে ঈশ্বর

একজনই আছেন। যে যার মত অনুসরণ করে ঈশ্বরের করুণা বা কৃপা লাভ করতে সক্ষম। কাজেই এটা সহজেই অনুমান করা চলে যে, যাঁরা বলেন—সব ধর্মই এক তাঁরা তাঁদের সীমাহীন অজ্ঞতা থেকেই এই সব কথা বলে থাকেন। এই সব অজ্ঞ ব্যক্তিরা প্রায়শই মুসলমানদের নিষ্ঠাবান মুসলমান হতে পরামর্শ দেন, কিন্তু তাঁদের জানা নেই যে, সেই ব্যক্তি নিষ্ঠাবান মুসলমান হলে তাঁর ধড় থেকে মাথা নেমে যাবে। কারণ নিষ্ঠাবান মুসলমানের সর্বপ্রথম কর্তব্যই হল বিধর্মীকে হত্যা করে স্বর্গের পথ পরিষ্কার করা।

হিন্দু সংস্কৃতির মূল ভিত্তি ত্যাগ ঃ

অনাদি কাল থেকে যে জনগোষ্ঠী আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষ নামক এই সুজলা-সুফলা ভূখণ্ডে বসবাস করে আসছে এবং যারা এই পবিত্র ভূখণ্ডকে তাদের 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' মা বলে মনে করে তারাই হিন্দু। আর এই হিন্দু জাতি হাজার হাজার বছর ধরে যে জীবনযাত্রা প্রণালী, ধর্মবিশ্বাস, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সুকুমার কলা এবং এক কথায় যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে তাই হিন্দুত্ব। কাজেই হিন্দুত্ব বলতে শুধু একখানা কোরান বা শুধু একখানা বাইবেল বোঝায় না। বাইবেলখানা পড়ে ফেললে একজন খ্রিস্টানের আর জানার কিছু বাকি থাকে না, বা কোরানখানা পড়ে ফেললে একজন মুসলমানেরও আর কিছু জানার বাকী থাকে না। পক্ষান্তরে হিন্দুত্বকে জানতে হলে সেই জিজ্ঞাসুকে যে বিশাল জ্ঞানভাণ্ডারের মধ্যে প্রবেশ করতে হবে, যে সূক্ষ্ম যুক্তিজালের সম্মুখীন হতে হবে এবং যে অপরিমেয় ধীশক্তির পরিচয় দিতে হবে তা বিস্ময়কর। সারাজীবন নিষ্ঠার সঙ্গে অনুশীলন করেও তিনি যে সে জ্ঞানভাণ্ডারের সমস্ত শাখা-প্রশাখাগুলিকে সম্যক উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। ম্যাক্সমূলর, শোপেনআওয়ার, ডয়সন, উইলসন, হান্টার প্রভৃতি ইয়োরোপীয় মনীষীগণ, যাঁরাই হিন্দুত্বকে জানার বাসনা নিয়ে এর মধ্যে প্রবেশ করেছেন, তাঁরাই এর বিশালতা উপলব্ধি করে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছেন, এর উদারতার কাছে শ্রদ্ধায় মাথা নত করেছেন এবং সারাজীবন এর কল্যাণময়ী বাণীর সাথে নিজেদের লীন করে দিয়েছেন।

সমগ্র হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতি দাঁড়িয়ে আছে একটা মূল বৈদিক সত্যের উপর—**সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম**। অর্থাৎ এই বিশ্বে দৃশ্য অদৃশ্য যা কিছু আছে তা সবই এক মূল চৈতন্যময় সত্ত্বা ব্রহ্ম-এর বিভিন্ন রূপ মাত্র।

যথা সুতীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ
সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাহক্ষরদ্বিবিধাঃ সৌম্য ভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিযন্তি।।

—যেমন এক প্রজ্বলিত অনল থেকে সহস্র সহস্র অগ্নিকণা নির্গত হয়, হে সৌম্য, সেইরূপ এক অক্ষর (ব্রহ্ম) থেকে সব কিছু জাত হয় এবং তাহাতেই বিলীন হয়। তাহলে মানুষসহ সমস্ত প্রাণীও এক ব্রহ্মেরই বিভিন্ন রূপ। আমি নিজেও সে ব্রহ্মেরই একটি রূপ। তাই বেদান্ত বলে—"**সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম**" এবং "**অহং ব্রহ্মাস্মি**"। অর্থাৎ সবকিছুই ব্রহ্ম এবং আমিও সেই ব্রহ্ম। এই একটি সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে তো বটেই, মানুষের সঙ্গে প্রাণিজগৎ তথা সমগ্র প্রকৃতির সমস্ত রকমের প্রভেদ নিমেষে ধূলিসাৎ হয়ে যায়। তখন ঘৃণাই বা করবে কাকে, আঘাতই বা করবে কাকে? অপরকে ঘৃণা করলে তো নিজেকেই ঘৃণা করা হয়, অপরকে

আঘাত করলে তো নিজেকেই আঘাত করা হয়। এই সর্বোচ্চ আদর্শ, মানবিকতার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন যা এই হিন্দু জাতি সমগ্র বিশ্বকে উপহার দিয়েছে।

এই সিদ্ধান্তকে ব্যাখ্যা করতে গীতা বলছে—হে অর্জুন সুখেই হোক আর দুঃখেই হোক, যে ব্যক্তি আত্মসাদৃশ্যে সর্বত্র সমদর্শী, সেই যোগীই সর্বশ্রেষ্ঠ (৬/৩২)। তাই পণ্ডিত শোপেনআওয়ার তাঁর The Philosophy of Upanisads গ্রন্থে লিখছেন—মানবিকতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসাবে বাইবেল সঠিকভাবে বলছে যে, "প্রতিবেশীকে নিজের মতই ভালবাস।" কিন্তু কেনো ভালবাসবো?...এর উত্তর বাইবেলে নেই, উত্তর আছে বেদে। "তৎ তম্ অসি" (তুমিই সেই ব্রহ্ম), এই তিনটি শব্দের মধ্যে একাধারে উপদেশ ও তার কারণ নিহিত রয়েছে (পৃঃ ৪৪)। তত্ত্বমসি যেমন মানবিকতার শেষ কথা, তেমনি তা সমস্ত দর্শনেরও শেষ কথা। তাই স্বামী বিবেকানন্দ লিখছেন—"যখনই 'তত্ত্বমসি' আবিষ্কৃত হইল তখনই আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্পূর্ণ হইল।" (বিঃ রঃ, ঐ, ৫/১৪১)।

ইসলাম বা খ্রিস্টধর্মের মতে এই মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য হল স্বর্গে যাওয়া, যেখানে গড বা আল্লা তাঁর ধর্মাবলম্বীদের জন্য নানারকম ভোগের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তাদের মতে আধ্যাত্মিকতার চরম পুরস্কার হল অনন্তকাল ধরে সেই স্বর্গসুখ ভোগ করা। এ ব্যাপারে কোরান বলছে, "সুখদ কাননে তারা মুখোমুখি হয়ে বসবে। তাদের ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে বিশুদ্ধ স্বর্গীয় সুরা, শুভ্র উজ্জ্বল পাত্রে, যা হবে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু। আর থাকবে লজ্জা-নম্র, আনতনয়না, সুরক্ষিত ডিমের মত উজ্জ্বল গৌরবর্ণা তন্বী স্বর্গীয় রমণীগণ।

ইসলামী মতে প্রত্যেক স্বর্গবাসী ৫০০ হুরী (স্বর্গীয় রমণী), ৪০০ কুমারী এবং আরও ৬০০০ অন্যান্য রমণী পাবে এবং সে এদের সকলের সঙ্গে মিলনে সক্ষম হবে। এই সব রমণীরা যে সমস্ত জামা-কাপড় পরে থাকবে তার বাইরে থেকে ভিতর দেখা যাবে।

কিন্তু হিন্দু বলে যে, এই পার্থিব জীবনের লক্ষ্য স্বর্গে গিয়ে ইন্দ্রিয়ভোগ করা নয়, আমি যে ব্রহ্ম সেই উপলব্ধি বা ব্রহ্মজ্ঞানই হল জীবনের লক্ষ্য। ভোগ ইন্দ্রিয়সাধ্য, কিন্তু ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। তাই ভোগের দ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায় না। ত্যাগ ও বৈরাগ্যের দ্বারাই তা লভ্য। **'ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্ব মানশুঃ'**। তাই গীতা বলছে—**'অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে'**। অর্থাৎ হে কৌন্তেয়, একমাত্র পুনঃপুন অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারাই তা সম্ভব। কাজেই হিন্দুর জীবন-যাপনের উদ্দেশ্য হল ত্যাগ—**'তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথা'**—বা ত্যাগের দ্বারাই ভোগ কর। আর এই কারণেই হিন্দুত্বের প্রতীক হল গৈরিক।

কাজেই সর্বোৎকৃষ্ট মানবিকতা, সর্বোৎকৃষ্ট সহনশীলতা এবং সর্বোৎকৃষ্ট জীবন-যাপনের যে মহান দর্শন হিন্দু বিশ্ববাসীকে উপহার দিয়েছে, তার কাছে একদিন সবাইকেই শ্রদ্ধায় মাথা নত করতে হবে। আজ ধনগর্বে মত্ত ইয়োরোপ ও আমেরিকার পক্ষে সরাসরি আত্মসমর্পণ করতে অহমিকায় বাধছে, কিন্তু সেদিনের আর বেশি বাকি নেই যেদিন নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদেই তাদের ভারতের দ্বারস্থ হতে হবে। তাদের ভোগবাদী সভ্যতা নির্বিচারে প্রকৃতিকে লুণ্ঠন করে পরিবেশের যে ক্ষতি করেছে, যে বিপদ ডেকে এনেছে, একমাত্র হিন্দুত্বই পারে সে বিপদ থেকে তাদের রক্ষা করতে। যে ভোগবাদ তাদের সমাজকে অবক্ষয়ের শেষ সীমায় নামিয়ে এনেছে, হিন্দুর "তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথা"র মন্ত্রই আবার তাদের সেখান থেকে তুলে আনতে এবং সুস্থ মানবজীবন ফিরিয়ে দিতে সক্ষম।

সুতরাং মার্কসবাদ নয়, একমাত্র হিন্দুত্বই পারে এক সুজলা-সুফলা পৃথিবী মানবজাতিকে উপহার দিতে। একমাত্র বেদ উপনিষদের উদার বাণীই পারে মানুষে মানুষে সমস্ত রকম বিভেদ ঘুচিয়ে বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে। মানুষে মানুষে সমস্ত রকম হানাহানি, মারামারি ও ঘৃণা-বিদ্বেষ দূর করে পৃথিবীতে চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করার মত আত্মিক শক্তি একমাত্র হিন্দুত্বেরই আছে।

ভারতে জাতীয়তাবাদের জাগরণ ও মার্কসবাদীদের কর্তব্য ঃ

একাদশ শতাব্দীতে মুসলমানদের আক্রমণ এবং তৎপরবর্তী প্রায় ৭০০ বছর ধরে মুসলীম পরাধীনতা এবং আরও ২০০ বছরের ব্রিটিশ পরাধীনতার ফলে হিন্দু সংস্কৃতি ক্রমাগত নিপীড়িত ও নিষ্পেষিত হয়েছে। ফলে হিন্দুত্বের প্রচুর বাহ্যিক ক্ষতি হয়েছে ঠিকই কিন্তু সে তার অন্তর্নিহিত শক্তিকে হারায়নি। এর আগে ইসলাম যেখানে গিয়েছে সেখানে সাবেক সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে ১০০ শতাংশ ইসলামীকরণ সম্ভব হয়েছে। হিন্দু সংস্কৃতির আত্মিক শক্তি তথা হিন্দু বীরদের সুদীর্ঘ ১০০০ বছর ধরে ক্রমাগত বাধাদানের ফলে ভারতে তা সম্ভব হতে পারেনি। ফলস্বরূপ ৭০০ বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে রাজত্ব করেও মুসলমানরা মাত্র ১১ শতাংশ হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করতে পেরেছিল। স্বামী বিবেকানন্দের হিসাব অনুযায়ী মুসলমানরা যখন ভারতে আসে তখন এখানে হিন্দুর সংখ্যা ছিল ৬০ কোটি। কিন্তু মুসলমান শাসনের যখন অবসান হয় তখন হিন্দুর সংখ্যা কমে দাঁড়ায় মাত্র ২০ কোটি। কাজেই বাদবাকি ৪০ কোটির এবং এই ৭০০ বছরে যত হিন্দু জন্মগ্রহণ করেছে তার সামান্য অংশ ধর্মান্তরিত হয়েছে এবং বাকি কোটি কোটি হিন্দুকে মুসলমানরা নির্বিচারে হত্যা করেছে। এতে এটাই প্রমাণ হয় যে, **হিন্দু প্রাণ দিয়েছে কিন্তু ধর্ম ত্যাগ করে ম্লেচ্ছ আরব্য সংস্কৃতি গ্রহণ করেনি।**

এ প্রসঙ্গে আরও একটা বিষয় স্মরণযোগ্য। আজকের পশ্চিমবঙ্গে মার্কসবাদী নেতাদের বেশিরভাগই পূর্ববঙ্গের বাসিন্দা ছিলেন এবং দেশভাগের সময় ধর্মরক্ষার জন্যই পূর্বপাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে এসেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল, পশ্চিমবঙ্গে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে তারা সবাই উদারবাদী সেকুলার ও মার্কসবাদী হয়ে গেলেন। যে ধর্মের জন্য তারা দেশত্যাগ করে এদেশে এলেন তাঁরাই এখন প্রচার চালাচ্ছেন, ধর্ম আফিম এবং পরিত্যাজ্য। এই প্রচার যদি তাঁরা পূর্বপাকিস্তান থেকেই করতেন তাহলে মার্কসবাদের প্রতি তাঁদের নিষ্ঠার ব্যাপারে কেউ সন্দেহ করতো না। কিন্তু কথায় ও কাজে যাদের মিল নেই তাদের ভণ্ড ছাড়া আর কিছুই বলার থাকে না।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলার আছে। আমাদের সর্বপ্রধান কর্তব্য হল, আমাদের সেইসব দেশভক্ত, নিষ্ঠাবান পূর্বপুরুষদের স্মরণ করা, যাঁরা অনেক প্রলোভন, অত্যাচার ও নিপীড়ন সত্ত্বেও ধর্ম ত্যাগ করেননি। যাঁরা বছরের পর বছর, শতাব্দীর পর শতাব্দী প্রতিনিয়ত বিনাশের আশঙ্কা ও ত্রাসের মধ্যে কাটিয়েছেন, চোখের সামনে তাঁদের প্রিয়জনের দেহ দ্বিখণ্ডিত হতে দেখেছেন, মা-বোনের সম্মান লুণ্ঠিত হতে দেখেছেন, কিন্তু তাঁদের ইষ্ট দেবতাকে ত্যাগ করেননি। যদি সেই সম্মানীয় পূর্বপুরুষেরা এই নিষ্ঠা ও দেশভক্তির পরিচয় না দিতেন তাহলে আজ আমাদের সকলের নাম আবদুল, রহিম বা করিম হয়ে যেত। এটাও হয়তো ঈশ্বরেরই লীলা যে, ভবিষ্যতে এই ভারতবর্ষ থেকেই ইসলামের উপর প্রতি-আক্রমণ হবে, তাই তিনি হিন্দু জাতিকে, হিন্দু সংস্কৃতিকে ধ্বংস না করে টিকিয়ে রেখেছেন। ঈশ্বরের হয়তো তাই ইচ্ছা যে, এককালে স্পেন যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল হয়তো ভবিষ্যতে ভারতকে বা ভারতের হিন্দু জাতিকে সেই একই ভূমিকা পালন করতে হবে।

যাইহোক, পরবর্তীকালের ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, হিন্দুত্ব তথা ভারতের জাতীয়তাবাদের পুনর্জাগরণের নিমিত্ত কোনো আন্দোলন আজ পর্যন্ত সংঘটিত হয়নি। কংগ্রেসের নেতৃত্বে যে স্বাধীনতা আন্দোলন হয়েছে তাকে কোনো মতেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বলা চলে না। কারণ কংগ্রেস হল সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী তাঁবেদার শিল্পপতি গোষ্ঠীর রাজনৈতিক সংগঠন মাত্র। তাই তাকে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস মীমাংসা, আবেদন-নিবেদন ও অহিংসার নিষ্ক্রিয় রাস্তাই বেছে নিতে হয়েছে। জাতীয় জাগরণের মধ্য দিয়ে বিদেশী শাসকদের বলপূর্বক বিতাড়নের কথা তাই সে কোনো দিনই বলতে পারেনি এবং কংগ্রেসের মধ্যে যে সব জাতীয়তাবাদী দেশভক্ত নেতা এই মত পোষণ করতেন তাঁরাও এই কারণেই কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। কাজেই কংগ্রেসের নেতৃত্বে এই স্বাধীনতা আন্দোলন দেশের জনসাধারণকে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ তো করেইনি বরং তাকে অবদমিত করেছে। সামান্য চৌরিচরার ঘটনার ছুতো দিয়ে প্রবল অসহযোগ আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেবার ঘটনা তার সাক্ষী হয়ে আছে। (এ প্রসঙ্গে বর্তমান লেখকের "ভারতীয় ঐতিহ্য ও গান্ধীবাদী অহিংসা" দ্রষ্টব্য।)

উপরন্তু হিন্দু-মুসলমানের যে মিলিত জাতীয়তাবাদের কথা আমাদের কংগ্রেসী এবং অন্যান্য মাননীয় ধর্ম-নিরপেক্ষ (?) নেতারা দিনরাত বলে চলেছেন, সে তত্ত্বও একেবারে নতুন এবং ভারতীয় ঐতিহ্যের পরিপন্থী। সর্বোপরি, মার্কসবাদের মত সে তত্ত্বও বিদেশী, অর্থাৎ ব্রিটিশ প্রভুদের কাছ থেকে ধার করা। মুসলমানরা কখনই ভারতের জাতীয়তাবাদ বা হিন্দুত্বের অংশীদার হতে পারে না। কারণ তারা ভারতের ইতিহাস (রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদি), দর্শন (বেদ, উপনিষদ, গীতা ইত্যাদি), ঐতিহ্য, সংস্কৃতি সব কিছুকেই বিধর্মী বলে বর্জন করে জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি হিন্দুত্বকেই অস্বীকার করে। তারা ভারতে বসবাস করে বটে কিন্তু তাদের আনুগত্য ও শ্রদ্ধা ভারতবর্ষের প্রতি নেই। তাদের আনুগত্য পড়ে আছে শুষ্ক ও মরুময় আরব দেশের প্রতি, মক্কা ও মদিনার প্রতি এবং অন্যান্য ইসলামী দেশের প্রতি। "বন্দে মাতরম্" গাইতে অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে তাদের বিজাতীয় চরিত্রই পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে। তাছাড়া যে সব বিদেশী অত্যাচারী মুসলমান দস্যুর দল ভারত আক্রমণ করে লুণ্ঠন করে গেল, ভারত শাসনের নামে অকথ্য অত্যাচার ও হত্যালীলা চালিযে গেল, আমাদের দেশের মুসলমানদের চোখে তারা অত্যাচারী দস্যু তো নয়ই, বরং পরিত্রাণকারী মিত্র। এই মনোভাবের প্রমাণ মেলে যখন এককালের ভারত আক্রমণকারী ও লুণ্ঠনকারী মহম্মদ ঘোরীর নামে পাকিস্তানের মুসলমানরা তাদের সর্বাপেক্ষা দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের নাম "ঘাউরি" রাখে। এদের মতে, এরা প্রথমে মুসলমান এবং তারপর ভারতীয় বা আর কিছু।

এ প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলার আছে। উপরিউক্ত নেহেরু মার্কা সেকুলার জাতীয়তাবাদের ভ্রান্ত তত্ত্ব ইংরাজদের শেখানো বুলি আউড়ে চলেছে যে, ভারতে ব্রিটিশ আসার আগে ভারতের কোনো জাতীয়তাবোধই ছিল না। এই কারণে স্কুল-কলেজে পাঠ্য ইতিহাস বইতে বিদেশী ইংরাজ লর্ড হিউম দ্বারা ভারতের জাতীয় কংগ্রেস স্থাপনের অধ্যায়কে "ভারতের জাতীয়তাবাদের উন্মেষ" আখ্যা দেওয়া হয়। এই জগা-খিচুড়ি জাতীয়তাবাদের তত্ত্ব অনুসরণ করেই মোহনদাস গান্ধীকে জাতির জনক আখ্যা দেওয়া হয়। কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, নেহেরু মার্কা নতুন এই জাতীয়তাবাদের তত্ত্ব অরবিন্দ, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

সর্বশেষে বলা যায় যে, নতুন এই সেকুলারবাদী, এই ভ্রান্ত জাতীয়তাবাদের তত্ত্ব জাতীয়তাবাদের চেতনার মূলে আঘাত করেছে। এরা মনে করে এবং প্রচার করে যে ভারতের মুসলমান শাসনের আমল পরাধীনতার আমল নয়। এই ব্যাপারে ঐতিহাসিক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় লিখছেন,

"বর্তমান যুগে এক সম্প্রদায়ের হিন্দু প্রচার করিয়াছেন যে ইংরাজ শাসনের পূর্বে ভারত কখনও পরাধীন হয় নাই, কারণ মুসলমানরা এদেশেই বসবাস করিত। এ যুক্তির অনুসরণ করিলে বলিতে হয় যে অস্ট্রেলিয়ার "মাওরী" জাতি এবং আমেরিকার "রেড ইন্ডিয়ান" অর্থাৎ আদিম অধিবাসীরা ধ্বংস হইয়াছে বটে কিন্তু কখনও পরাধীন হয় নাই, কারণ ইংরেজ শাসকরা তাহাদের দেশেই বাস করিত।" (বাংলা দেশের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ১৩শ পরিচ্ছেদ, ৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদ।)

এই ভ্রান্ত মত পোষণ করার ফল হয়েছে এই যে, এই তত্ত্ব মুড়ি মিছরির একদর করে ফেলেছে। আক্রমণকারী ও দখলদার মুসলমান দস্যুর দল এবং রানা পৃথ্বীরাজ, রানা প্রতাপ, রাজা শিবাজীর মত দেশপ্রেমকি বীর যোদ্ধাদের এই তত্ত্ব একই আসনে বসিয়েছে। শুধু তাই নয় অত্যাচারী, চরিত্রহীন, নৃশংস লম্পট আকবরের মত মুসলমানকে সর্বজগৎমান্য মহামতি সম্রাট অশোকের মত মহান বলে প্রচার চালাচ্ছে। তবে সুখের কথা হল এই যে, শুধু মুসলমানদের ভোট পাবার জন্য তাদের এই সব হীন ও জঘন্য প্রচেষ্টা দেশের লোক বুঝতে শিখেছে।

আমাদের মার্কসবাদীদের আশু কর্তব্য ঃ

আজকে আমাদের মার্কসবাদী নেতৃবৃন্দকে নিষ্ঠাবান ও সঠিক মার্কসীয় পথই অনুসরণ করতে হবে। সেই সঠিক মার্কসীয় পথ স্বয়ং মার্কসই নির্দেশ করে দিয়েছেন। মার্কস শ্রমিকশ্রেণিকে কখনও জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়া বিপ্লবের আগে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে সামিল হবার জন্য নির্দেশ দিয়ে যাননি। পক্ষান্তরে জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়া বিপ্লবে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে তাকে সাফল্যমণ্ডিত করার কথাই বলে গেছেন। এই কারণেই জার্মানীর শ্রমিক শ্রেণি ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের সময় জাতীয়তাবাদী ছোট বুর্জোয়াদের শিবিরে যোগ দেয় এবং বৃহৎ বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে লড়াই করে জাতীয়তাবাদী বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করে এবং মার্কস জার্মান শ্রমিকশ্রেণির এই ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন। ঠিক একই কারণে ১৯১৭ সালের নভেম্বর বিপ্লবের কয়েক মাস আগে (মার্চ মাসে) রাশিয়ান শ্রমিকশ্রেণি জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি মেনশেভিকদের সঙ্গে যোগ দিয়ে, সামন্তবাদী জারতন্ত্রকে উৎখাতের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়া বিপ্লব সফল করেছিল, এবং লেনিন রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণির এই ভূমিকাকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেছিলেন।

১৯৪৭ সালে ভারত রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েছে ঠিকই, কিন্তু অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সে আজও পরাধীন এবং মার্কসবাদী তত্ত্ব অনুসারে এই অর্থনৈতিক দাসত্ব পরাধীনতারই নামান্তর। উপরন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসকে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিশ্লেষণ করে এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, পরাধীনতার আমলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিয়ন্ত্রণ এবং পরবর্তীকালে নয়া উপনিবেশবাদীদের হস্তক্ষেপের ফলেই ভারতে ধনতন্ত্রের স্বাভাবিক বিকাশ হতে পারেনি এবং এই কারণেই ভারতে ভূমি সংস্কার হয়নি এবং আজও সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্র পাশাপাশি অবস্থান করতে সক্ষম হচ্ছে।

তাছাড়া ভারতের বর্তমান বুর্জোয়া শাসকগোষ্ঠী ঋণের জালে আজ নিজেদের এতোটাই জড়িয়ে ফেলেছে যে স্বাধীন সত্ত্বা বলে তাদের আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। বৈদেশিক ঋণ আজ একলক্ষ কোটি ছাড়িয়ে গেছে এবং ঋণের কিস্তি ও সুদ মেটাতে জাতীয় আয়ের প্রায় ২৮ শতাংশ ব্যয় হয়ে যাচ্ছে। তাই নিরুপায় হয়ে তারা "গ্যাট চুক্তি" অনুমোদন ও বিশ্বায়ন-এর নামে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের সমস্ত রাস্তা খুলে দিয়ে নয়া উপনিবেশবাদীদের কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের রাস্তাই বেছে নিয়েছে।

এ অবস্থায় একটা পবল জাতীয়তাবাদী বিপ্লবই ভারতকে রক্ষা করতে পারে। সেই বিপ্লব সামন্ততন্ত্রকে ধ্বংস করে ধনতন্ত্রকে পূর্ণ বিকশিত করতে পারে এবং জনগণের মধ্যে এই প্রবল জাতীয়তাবাদী চেতনা সঞ্চারিত করে স্ব-নির্ভর অর্থনীতি গঠন করার মধ্য দিয়ে ভারতকে বিদেশী দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে পারে। আজ হিন্দুত্বের জাগরণের মধ্য দিয়ে বহু আকাঙ্ক্ষিত সেই জাতীয়তাবাদী বিপ্লব ভারতের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত এবং ভারতের সমস্ত দেশপ্রেমিক মানুষের উচিত, দলমত নির্বিশেষে সেই বিপ্লবকে সাদরে অভ্যর্থনা করা এবং সর্বতোভাবে তাকে সাহায্য করে সাফল্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

হিন্দুত্বই যেহেতু ভারতের জাতীয়তাবাদ তাই এই বিপ্লব যে হিন্দুত্বের নবজাগরণের পথ ধরেই অগ্রসর হবে সে ব্যাপারে কোনো দ্বিমত থাকতে পারে না। আর এই হিন্দুত্বের কথা বলার জন্যই আমাদের মার্কসবাদী নেতৃত্ব, রজ্জুতে সর্পভ্রমের মত যদি এর জাতীয়তাবাদী চরিত্রকে অস্বীকার করেন এবং একে ধর্মীয়, সাম্প্রদায়িক কিংবা ফ্যাসিস্ট আখ্যা দেন এবং এর বিরুদ্ধাচরণ করেন তবে তা হবে এক মারাত্মক ঐতিহাসিক ভুল। এ ভুলের জন্য ইতিহাস তাঁদের ক্ষমা করবে না। আরও বড় প্রশ্ন হল, এই মৌলিক সিদ্ধান্তে ভুলের জন্য ভবিষ্যতে প্রতিপদে ভুল পদক্ষেপ নিতে হবে এবং মূল জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে ভুল করার জন্য বা জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধাচারণ করে যে ভুল পদক্ষেপ তারা গ্রহণ করবেন তা থেকে দেশবাসী তাদের দেশদ্রোহী বলেই চিহ্নিত করবে এবং পরিশেষে বর্জন করবে। প্রকৃতপক্ষে এই ভুল পদক্ষেপের জন্যই আজ শুধু অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এক বিদেশিনী মহিলার দ্বারস্থ হতে হয়েছে। কিন্তু ডুবন্ত নৌকার নিয়মই হল, সে নিজেও ডোবে এবং যারা তাতে আরোহণ করে তারাও ডোবে। মার্কসবাদীদের স্মরণ রাখা দরকার যে, কালিদাস যেই ডালে বসেছিলেন সেই ডালের গোড়া কাটার জন্য তাকে মূর্খ বলা হয়ে থাকে। তাই যে মূল তত্ত্বের উপর তাঁরা আশ্রয় গ্রহণ করে আছেন সেই তত্ত্বকে কুঠারাঘাত করলে তাঁদের পতনও অনিবার্য।

শেষ কথা হিসাবে বলা যায় যে ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর যে বিপ্লবের শুভ সূচনা হয়েছে তা জয়যুক্ত হবেই। পৃথিবীর এমন কোনো শক্তি নেই যা এর গতিকে রোধ করতে পারে। যারা এই বিপ্লবের বিরোধিতা করবে তাদের বিনাশ অনিবার্য এবং ইতিহাসের আস্তাকুঁড়েই তাদের স্থান নির্দিষ্ট হয়ে আছে।

সি পি এম মার্কসবাদের মূল নীতিকেই পদদলিত করছে

উত্তর প্রদেশে কল্যাণ সিংয়ের নেতৃত্বে সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া থেকে শুরু করে ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি মার্কসবাদীদের মধ্যে দু'রকমের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। গত ২৪ অক্টোবর দিল্লির এক সাংবাদিক সম্মেলনে সি পি আই দলের পক্ষ থেকে বলা হল যে, বি জে পি-কে কোণঠাসা করার জন্য প্রয়োজন হলে সি পি আই সরাসরি কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলাতে প্রস্তুত। ওই একই দিনে কোলকাতায় আয়োজিত ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রয়াত নেতা চিত্ত বসুর স্মরণ সভায় জ্যোতি বসু বললেন, এতদিন তাঁর দল শুধু প্রতিক্রিয়াশীল কংগ্রেসের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করে এসেছে কিন্তু এখন থেকে কংগ্রেস ও বি জে পি, দুইয়ের বিরুদ্ধেই লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। তিনি আরও বলেন সমস্ত বাম দলগুলির (এস ইউ সি বাদে) উচিত অবিলম্বে এককাট্টা হয়ে তৃতীয় ফ্রন্টকে শক্তিশালী করা এবং একদিকে কংগ্রেস ও অন্যদিকে বি জে পির বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেমে পড়া।

কিন্তু প্রশ্ন হল, বাম দলগুলির দ্বারা তৃতীয় ফ্রন্ট গঠন করা এবং একসঙ্গে কংগ্রেস ও বি জে পির বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেমে পড়ার এই আহ্বান কতখানি মার্কসবাদ-সম্মত? মার্কসবাদ সব সময় দ্বিমুখী সংঘাতের কথাই বলে, ত্রিমুখী সংঘাতের কথা নয়। এই কারণেই মার্কসবাদী তত্ত্বের নাম 'ডায়ালেকটিক্যাল মেটেরিয়ালিজম্'। ইংরাজিতে Dia (ডায়া) বলতে দুই বোঝায়, তিন নয়। উপরিউক্ত ডায়ালেকটিক্যাল মেটেরিয়ালিজম বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের তিনটি মূল সূত্রের ওপর মার্কসবাদের সৌধ দাঁড়িয়ে আছে। এই তিন সূত্র হল— (১) বিপরীত শক্তির স্বরূপ নির্ণয়ের সূত্র (Law of Interpretation of Opposites), (২) পরিমাণ থেকে গুণে উত্তরণের সূত্র (Law of Transformation of Quantity into Quality) এবং (৩) অস্বীকারকে অস্বীকারের সূত্র (Law of Nagation of Negation)।

উপরিউক্ত প্রথম সূত্র বা বিপরীত শক্তির স্বরূপ নির্ণয়ের সূত্র পরোক্ষভাবে দুটো শক্তির উপস্থিতির কথাই বলে। মার্কসের বন্ধু ফ্রেডরিক এঙ্গেলস্ তাঁর 'ডায়ালেকটিক অফ নেচার' গ্রন্থে বিষয়টা আরও বিষদভাবে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে, চুম্বকের মেরু যেমন দু'রকমেরই হয়, তেমনি দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ দুটো বিপরীত শক্তির উপস্থিতিই স্বীকার করে। উক্ত গ্রন্থে তিনি আরও বলেন, "গতিহীন কোনো বস্তু চিন্তা করা যায় না। কিন্তু কিসের প্রভাবে এই গতির সৃষ্টি হয়? মাত্র দু'রকমের শক্তির প্রভাবেই এই গতির সৃষ্টি হয়—আকর্ষণ শক্তি ও বিকর্ষণ শক্তি।" কাজেই দেখা যাচ্ছে যে ফ্রেডরিক এঙ্গেলস্ও দুরকম শক্তির উপস্থিতির কথাই স্বীকার করে গেছেন, তিন রকম নয়।

মার্কসবাদ অনুসারে একটা শ্রেণিবিভক্ত সমাজের বিভিন্ন শ্রেণিগুলির মধ্যে নানারকম স্বার্থের সংঘাত সর্বদাই বিদ্যমান এবং পুঁজিবাদ বা ক্যাপিটালিজম্-এর উদ্ভব হবার পর সম্পূর্ণ নতুন এক সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণি জন্মলাভ করেছে, যে শ্রেণি সর্বাপেক্ষা অধিক শোষিত। মার্কসবাদের অন্তিম লক্ষ্য হল, এই সর্বহারা শ্রেণিকে সংগঠিত করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা ও শ্রমিকশ্রেণির একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। এই মূল লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য উপরিউক্ত তিনটি সূত্র হল রণকৌশল। প্রথম সূত্র বিপরীত শক্তির স্বরূপ নির্ণয় বলছে যে, অন্য সব শ্রেণিগুলিকে পরাভূত করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের কাজটা একটি একটি করে শ্রেণিকে উৎখাত করার মাধ্যমে

ধাপে ধাপে করতে হবে। একসঙ্গে সব শ্রেণির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে নয়।

শ্রেণিবিভক্ত সমাজের শ্রেণিগুলোর মধ্যে বহুরকমের স্বার্থের সংঘাত বর্তমান থাকলেও কোনো একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ একটা সংঘাত প্রবল হয়। সেই মূল সংঘাতকে কেন্দ্র করে সমস্ত শ্রেণিগুলি তখন সরাসরি দুটো বিবদমান শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায়। এই রকম একটা পরিস্থিতিতে প্রথম সূত্র কাজে লাগাতে হবে। প্রথমত, সর্বহারা শ্রেণিকে তখন এটা স্থির করতে হবে যে, দুই শিবিরের মধ্যে কোন্ শিবির অপেক্ষাকৃত বেশি প্রগতিশীল। দ্বিতীয়ত, শ্রমিক শ্রেণী তখন ওই অপেক্ষাকৃত বেশি প্রগতিশীল শিবিরের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করবে এবং এই যুক্ত করার মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় সূত্র বা 'পরিমাণ থেকে গুণে উত্তরণের সূত্র' কার্যকর হবে। অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণি যেই শিবিরে যোগ দেবে সেই শিবিরের শক্তি পরিমাণগত ভাবে বৃদ্ধি পাবে এবং শক্তির এই পরিমাণগত বৃদ্ধি বিজয়ী হবার গুণগত মানের সৃষ্টি করবে।

১৮৪৮ সালে জার্মানীর বিপ্লবের সময় যে দুই বিবদমান শিবিরের সৃষ্টি হয়, তার মধ্যে প্রথম শিবিরে ছিল বৃহৎ পুঁজিপতি ও সামন্ত প্রভুরা এবং দ্বিতীয় শিবিরে ছিল জাতীয়তাবাদী ক্ষুদ্র ও মাঝারি পুঁজিপতিরা। জার্মান শ্রমিকশ্রেণি তখন অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল দ্বিতীয় শিবিরে যোগ দেয় এবং তাদের এই ভূমিকাকে মার্কস শ্রমিকশ্রেণির যথার্থ ভূমিকা বলে ভূয়সী প্রশংসা করেন (Rheinische Zeitung-18.3.1848)।

রাশিয়াতেও ঠিক একই ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। ১৯১৭ সালে, বলশেভিক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ঠিক পূর্বে যে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হয় তাতে রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণি মেনশেভিকদের সঙ্গে যোগ দিয়ে জারতন্ত্রের পতন ঘটাতে ও আলেকজাণ্ডার কেরেনস্কির নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করতে সাহায্য করে। লেনিন বিদেশ থেকে রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণির এই ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং বলেন, "শ্রমিকরা, তোমরা সর্বহারার বীরত্বের এবং জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জনসাধারণ ও শ্রমিকশ্রেণির মিলিত বীরত্বের এক তুলনাহীন নজির সৃষ্টি করেছ। শ্রমিকশ্রেণির সংঘবদ্ধতা এবং জনগণ ও শ্রমিকশ্রেণির সংঘবদ্ধতার দ্বারা এক অসাধ্য সাধন করেছ। এই সংঘবদ্ধতাকে এবার বিপ্লবের দ্বিতীয় স্তরের বিজয় হাসিল করতে কাজে লাগাতে হবে। তাহলে বিপ্লবের প্রথম স্তর বলতে কি বোঝায়? বোঝায় জারতন্ত্রের হাত থেকে রাষ্ট্রক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে পুঁজিপতিদের হাতে তা তুলে দেওয়া" (First Letter : An Assessment of the Present Situation–April, 1917)।

এইভাবে একে একে সমস্ত বৈরীশ্রেণিকে পরাভূত করার পর শ্রমিকশ্রেণি পুঁজিপতিদের ওপর চরম আঘাত হানবে এবং তাদের হাত থেকে রাষ্ট্রক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে শ্রমিকশ্রেণির একনায়কতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রী সরকার গঠন করবে। এই কাজের মধ্য দিয়ে তৃতীয় সূত্র 'অস্বীকারকে অস্বীকার' কার্যকর হবে। অর্থাৎ আদিম সমাজতন্ত্রকে অস্বীকার করে যে সমস্ত সমাজব্যবস্থা কায়েম হয়েছিল সেই সব সমাজব্যবস্থাকে অস্বীকারের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটবে।

মার্কসবাদী তত্ত্ব অনুযায়ী ভারতের সমস্ত শ্রেণিগুলো আজ সরাসরি দুই শিবিরে বিভক্ত। প্রথম শিবিরে আছে কংগ্রেস ও তার সহযোগী দলগুলো এবং দ্বিতীয় শিবিরে আছে বিজেপি ও তার সহযোগী দলগুলো। এই ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে ভারতের সমস্ত মার্কসবাদীদের প্রথম

কর্তব্য হল এই দুই শিবিরের মধ্যে কোন্ শিবির অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল তা নির্ধারণ করা এবং দ্বিতীয় কর্তব্য হল সেই শিবিরে যোগ দিয়ে অপেক্ষাকৃত প্রতিক্রিয়াশীল শিবিরকে পরাজিত করার চেষ্টা করা। কোনো মতেই একসঙ্গে দুই শিবিরের সঙ্গে শত্রুতা করা নয়।

কাজেই এ ব্যাপারে সি পি আই-এর বক্তব্য অনেক সহজবোধ্য ও মার্কসবাদসম্মত। তাদের বিশ্লেষণ (সে বিশ্লেষণ ভ্রান্ত না অভ্রান্ত তা পরের কথা) অনুযায়ী কংগ্রেস ও অন্যান্য তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির শিবির বেশি প্রগতিশীল এবং তাই তারা সে শিবিরে যোগ দিয়ে অপেক্ষাকৃত প্রতিক্রিয়াশীল বি.জে.পি. শিবিরকে পরাজিত করার কথা বলছে। কিন্তু সি পি এম-এর বেলায় ব্যাপারটা একটু অন্যরকমের। তাদের বিচারেও বিজেপি প্রতিক্রিয়াশীল। কিন্তু সরাসরি কংগ্রেস শিবিরে যোগ দেবার কথা তাদের পক্ষে বলা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ, কংগ্রেস বিরোধিতার দ্বারাই তারা পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় টিকে আছে। তাই দিল্লিতে কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলালে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় থাকা কঠিন হবে। পশ্চিমবঙ্গের ভোটারের কাছে ভোট চাওয়া কঠিন হবে। তাই জ্যোতিবাবু একহাতে কংগ্রেস ও আর একহাতে বি.জে.পি.র সঙ্গে যুদ্ধ করার মতো অ-মার্কসীয় কথা বলছেন।

এটা ভারতের দুর্ভাগ্য যে, ভারতের মার্কসবাদীরা বিদেশী নানা তত্ত্ব অধ্যয়ন করেছেন কিন্তু নিজের দেশ ভারত সম্বন্ধে জানার জন্য খুব কম গ্রন্থই অধ্যয়ন করেছেন। আরও দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হল, ভারতের মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীরা ভারতকে দেখতে চেষ্টা করেন বিদেশী তত্ত্বের চশমা চোখে দিয়ে। তা না হলে তাঁরা ভারতের জাতীয়তাবাদী শক্তি বি.জে.পি.-কে ধর্মান্ধ, স্বৈরাচারী, ফ্যাসিস্ট শক্তি বলে ভুল করতেন না। রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, বিবেকানন্দ, প্রফুল্লচন্দ্র এরকম আরও অনেক মনীষী একথা নির্দ্বিধায় বলে গেছেন যে, হিন্দুত্বই ভারতের জাতীয়ত্ব। বিদেশী শব্দ 'রিলিজিয়ন' যে সংস্কৃত শব্দ 'ধর্ম'-এর সমার্থবোধক নয়, তা গত ১৯৯৫ সালের ১১ই ডিসেম্বর মাননীয় সুপ্রীম কোর্ট তার ঐতিহাসিক রায়ের দ্বারা মীমাংসা করে দিয়েছেন। ওই রায়ে মাননীয় বিচারপতিগণ এ কথাই বলেছেন যে, হিন্দু ধর্ম পাশ্চাত্যের 'রিলিজিয়ন' শব্দের প্রতিশব্দ নয়। হিন্দু শব্দের অর্থ অনেক ব্যাপক। হিন্দু বলতে বোঝায় একটা সভ্যতা, একটা সংস্কৃতি, হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসা একটা জীবনধারা। তাই হিন্দুত্বের কথা বলে ভোট চাওয়া সাম্প্রদায়িক নয়।

হিন্দুত্বের অপর নাম ভারতীয়ত্ব, তার আর একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ হল, ভারতের যে যে অংশে হিন্দুর সংখ্যা কমে যাচ্ছে, সেই সেই অংশেই বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। এ থেকে হিন্দুত্বই যে ভারতের জাতীয়ত্ব শুধু তাই প্রমাণ হয় না, সঙ্গে সঙ্গে এটাও প্রমাণ হয় যে, ভারতবর্ষকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে গেলে হিন্দুত্বের প্রসার অপরিহার্য। এ প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলা দরকার। কোনো কিছুকে ভারতীয় বললে তার উৎস তার উৎপত্তি স্থল সম্বন্ধে সন্দেহ পুরোপুরি দূর হয় না। কিন্তু হিন্দু বললে উৎপত্তি স্থল যে ভারতবর্ষ সে সম্বন্ধে সন্দেহের আর কোনো অবকাশ থাকে না। এই কারণে বিদেশী পণ্ডিতরাও প্রাচীন ভারতীয় গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, সাহিত্য, শিল্পকলা ইত্যাদিকে বোঝাতে আগে হিন্দু শব্দ যোগ করেন। যেমন হিন্দু গণিত, হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদি। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই ধারা অনুসরণ করেই তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম ''হিন্দু রসায়ন'' দিয়েছেন।

আর একটা কথা হল, মার্কসবাদের মতে অর্থনৈতিক কাঠামোই হল মূল কাঠামো এবং রাজনীতি তার একটা পরিকাঠামো মাত্র। এতে করে এটাই বোঝায় যে, বি.জে.পি.র-ও একটা অর্থনৈতিক কাঠামো আছে বা বি.জে.পি.র পিছনে একটা আর্থিক শক্তি কাজ করছে। কাজেই বি.জে.পি একটা ধর্মান্ধ, সাম্প্রদায়িক, ফ্যাসিস্ট দল ইত্যাদি গালাগাল দিয়েই প্রকৃত মার্কসবাদীর দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। তাদের কর্তব্য বিশ্লেষণ করে দেখা যে, তার পিছনে কোন্ অর্থনৈতিক শক্তি কাজ করছে। যদি দেখা যায় যে তার পিছনে যে অর্থনৈতিক কাঠামো কাজ করছে তা জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়া শক্তি, তবে বি.জে.পি অবশ্যই একটা জাতীয়তাবাদী দল।

শেষ কথা হিসাবে বলতে হয় যে, আজকের মার্কসবাদী নেতারা তাঁদের নিজ নিজ ব্যক্তিগত স্বার্থের খাতিরে অনেক কিছুই বলছেন। গরিবের সরকার বলে ভোট নিয়ে গরিব হকারদের উচ্ছেদ করছেন, প্রোমোটারদের স্বার্থে ভাড়াটিয়া আইন সংশোধন করছেন। স্বার্থের খাতিরে তাঁরা হ্যাঁ-কে না, না-কে হ্যাঁ বলছেন। যাকে সমর্থন করা উচিত নয়, তাকে সমর্থন করতে বলছেন, আর যাকে সমর্থন করা উচিত তার বিরুদ্ধে কুৎসা গাইতে বলছেন। কাজেই যে সব মার্কসবাদী কর্মী যাঁরা দেশের কথা ভাবেন, আদর্শের কথা ভাবেন, শুধু স্বার্থের খাতিরে চলেন না, তাঁদের উচিত নেতাদের কথায় বিভ্রান্ত না হয়ে নিজ নিজ বিচারবুদ্ধি অনুসারে কর্তব্য ঠিক করা। লেনিন কখনও ডুবন্ত নৌকায় মার্কসবাদীদের চড়তে বলেননি। তাই দেশের এই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে নিজের বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী কাজ করতে হবে। ভুল করা চলবে না। আসন্ন জাতীয়তাবাদী বিপ্লবে নিজেদের যুক্ত করাই বর্তমানে ভারতের মার্কসবাদীদের একমাত্র কর্তব্য।

মার্কসীয় বিপ্লবের ফলে যে সমাজব্যবস্থা কায়েম হয় তা অতি ভয়ংকর

বতর্মানে একটা দেয়াল-লিখন খুব দেখা যাচ্ছে। তা হল, "মার্কসবাদ সর্বশক্তিমান, কারণ ইহা সত্য।" মার্কসবাদ সত্য কি মিথ্যা তা পরের কথা, তবে মার্কসবাদ যে সত্য সেটা কোনো অ-মার্কসবাদী বললে অনেক বেশি গ্রহণীয় মনে হত। সত্য উজ্জ্বল, সত্য ভাস্বর। সূর্য উঠলে যেমন আলো জ্বালিয়ে দেখার দরকার হয় না, সত্যও সেই রকম স্বপ্রকাশ, কাউকে চিনিয়ে দেবার দরকার হয় না যে ওটা সত্য।

সত্য এক, সত্য কখনও দ্বৈত হতে পারে না। কাজেই দুনিয়ায় যত মার্কসবাদী আছেন তাঁরা সবাই এক সত্যের পথের পথিক। তাহলে মার্কসবাদীদের মধ্যে এতো দলাদলি কেন? এক ভারতেই মার্কসবাদীদের দলের শেষ নেই। এ ছাড়াও আছে, এক দেশের মার্কসবাদীদের সঙ্গে অন্য দেশের মার্কসবাদীদের মতানৈক্য ও মতবিরোধ। জনসাধারণের পক্ষে তাই বুঝতে অসুবিধা হয় যে, কাদের মার্কসবাদ সত্য।

যে বাণী বা তত্ত্ব দেশ কালের সাপেক্ষে অপরিবর্তিত থাকে তাকেই অভ্রান্ত সত্য বলে মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু মার্কসবাদের বেলায় তা খাটে না। এককালে মার্কসীয় বিচারে নেতাজি ছিলেন ফ্যাসিস্ট, জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজো-র গাধা এবং গোয়েবলস্-এর পোষা কুকুর এবং রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বুর্জোয়া কবি এবং পরিত্যাজ্য। কিন্তু আজকের মার্কসীয় বিচার আর সে-কথা বলে না। রাশিয়ায় মার্কসবাদ অনুযায়ী শ্রমিকশ্রেণিই হল আসল শক্তি এবং তাদের সংগঠিত করেই বিপ্লব করার ডাক দিলেন লেনিন। কিন্তু চিনের মার্কসবাদ অনুযায়ী কৃষকরাই হল প্রধান শক্তি এবং মাও-সে-তুং তাদের দিয়েই বিপ্লব সংগঠিত করলেন। বিপ্লবের আগের মার্কসবাদ অনুযায়ী গোর্কী ছিলেন মহান প্রগতিশীল লেখক, কিন্তু বিপ্লবের পরের মার্কসবাদ প্রমাণ করল তিনি ভীষণ প্রতিক্রিয়াশীল এবং তাই তাকে ইতালীতে নির্বাসনে গিয়ে প্রাণ রক্ষা করতে হল।

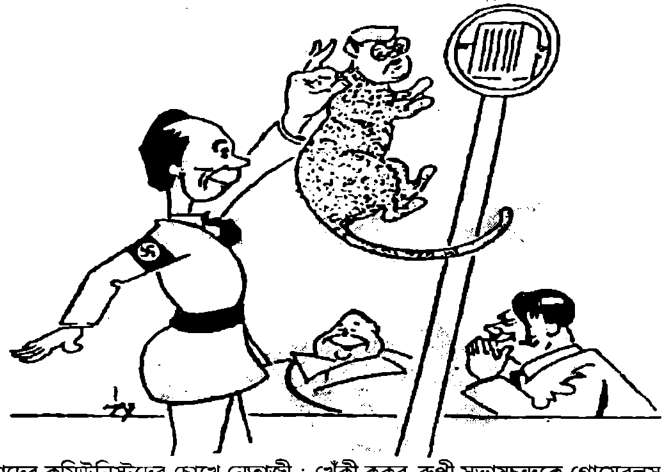
মার্কসীয় বস্তুবাদী দর্শনের একটা সূত্র হল "অস্বীকারের অস্বীকার" বা negation of negation। এই সূত্র বলছে যে, একটা সমাজব্যবস্থাকে অস্বীকার করে আমরা নতুন একটা সমাজব্যবস্থায় উপনীত হই এবং কালে এই সমাজকেও অস্বীকার করে নতুনতর এবং উন্নততর আর একটা সমাজব্যবস্থা গ্রহণ করি। এইভাবে অগ্রসর হতে হতে, এক সময় দেখা যাবে যে, পুরানো যে সমাজব্যবস্থকে আমরা অস্বীকার করেছিলাম সেই অস্বীকারকে আবার অস্বীকার করছি। অর্থাৎ পুরানো সেই সমাজ ব্যবস্থাতেই আবার ফিরে আসছি। এই সূত্রকে অবলম্বন করে মার্কস বললেন যে, মানুষ যখন বন্য ছিল এবং কেউ কারও পরাধীন ছিল না, সেই আদিম সমাজতন্ত্রকে অস্বীকার করে ক্রীতদাস প্রথার উন্নত সমাজ ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। কালক্রমে এই দাসপ্রথার সমাজকে অস্বীকার করে সামন্তপ্রথা এবং সামন্তপ্রথার সমাজকে অস্বীকার করে বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মার্কস ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে এই ধনতান্ত্রিক সমাজকে অস্বীকার করে আবার সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ফিরে আসবে এবং তাতে করে আদিম সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অস্বীকারের অস্বীকার হবে।



আমাদের কমিউনিস্টদের চোখে নেতাজী : গর্দভরূপী সুভাষচন্দ্র তোজোকে বহন করছেন।
—পিপল্‌স ওয়ার, ১৯ জুলাই, ১৯৪২

কিন্তু আদিম সমাজতন্ত্র আদিমতর কোনো ধনতান্ত্রিক সমাজকে অস্বীকার করে পৃথিবীতে আসেনি। কাজেই মার্কসের অস্বীকারের অস্বীকার তত্ত্বকে সত্য বলে মেনে নিলেও এ কথা প্রমাণ হয় না যে, বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজকে অস্বীকার করে সমাজতন্ত্রই আসবে। অন্য কি সমাজব্যবস্থা আসবে তা কারও পক্ষেই বলা সম্ভব নয়, ভবিষ্যৎ সকলেরই অজানা।

মার্কসবাদের মতে একটা পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিকশ্রেণি এবং কৃষকশ্রেণি, এরাই হল সম্পদ সৃষ্টিকারী শ্রেণি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সর্বাপেক্ষা শোষিত শ্রেণি। এই দুই শ্রেণির মধ্যে শ্রমিকরা বেশি সংগঠিত বলে অধিকতর অগ্রসর এবং কমিউনিস্ট পার্টি মূলত এই শ্রমিকশ্রেণিরই পার্টি। তবে কৃষকরা তার পাশে থাকবে এবং বিপ্লবে তাকে সহায়তা করবে। কমিউনিস্ট মেনিফেস্টোতে মার্কস আরও বললেন যে, যেহেতু শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে শিক্ষাদীক্ষার তেমন প্রসার নেই, নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা নেই, তাই এ কাজের জন্য মধ্যবিত্ত শ্রেণিকেই এগিয়ে আসতে হবে এবং তারাই হবে শ্রমিকশ্রেণির পথপ্রদর্শক।



আমাদের কমিউনিস্টদের চোখে নেতাজী : খেঁকী কুকুর-রূপী সুভাষচন্দ্রকে গোয়েবলস উঁচুতে তুলে ধরেছে— পিপল্‌স ওয়ার, ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৪২

কাজেই কমিউনিস্ট পার্টিকে শ্রমিকশ্রেণির পার্টি বলা হলেও মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরাই তার সমস্ত নেতার পদ অলংকৃত করে বসলেন। কেন্দ্রীয় কমিটি, পলিটব্যুরো সবই মধ্যবিত্ত শ্রেণি নিয়ে গঠিত হল। কাজেই, কমিউনিস্ট পার্টি শুধু নামেই শ্রমিকশ্রেণির পার্টি হয়ে থাকল, কোনো সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা শ্রমিকশ্রেণির হাতে থাকল না। তাই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, বিপ্লবের পরে পুরানো জার, পুঁজিপতি ও কুলাকশ্রেণির হাত থেকে কার্যক্ষেত্রে কোন্ শ্রেণির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হল। আমাদের দেশের দিকে তাকালে ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হবে। আজ প্রায় ৩৩ বছর হল আমাদের পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট শাসন চলছে, অর্থাৎ মার্কসবাদ অনুযায়ী শ্রমিকশ্রেণির শাসন চলছে, অথচ মন্ত্রিসভা, রাজ্যকমিটি, জেলা কমিটি সবই মধ্যবিত্তের দখলে। খুঁজলে একজন শ্রমিকও সেখানে পাওয়া যাবে না।

এ ব্যাপারে ফরাসী বিপ্লবের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। সেখানে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের পতাকাতলে মানুষ একত্রিত হয়ে বিপ্লব সফল করেছিল। তখন বোঝা যায়নি যে দেশের ব্যবসায়ী শ্রেণি এই বিপ্লবের উদ্যোক্তা এবং তাদের মূল উদ্দেশ্য সামন্ত প্রভুদের হাত থেকে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা। হলও তাই। বিপ্লবের পরে সেখানে পুঁজিবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হল। অর্থাৎ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে শুধু দেশের শোষক শ্রেণির পরিবর্তন হল।

কিন্তু মার্কসীয় বিপ্লবের ফলে যে সমাজ ব্যবস্থা কায়েম হল তা অতি ভয়ংকর। মার্কসীয় তত্ত্ব অনুযায়ী বিপ্লবের পরে শ্রমিকশ্রেণির একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার কথা। একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল বটে, তবে তা নতুন মধ্যবিত্ত শোষক শ্রেণির একনায়কতন্ত্র। রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের সাথে সাথে তারা সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করে ফেলল এবং সমালোচনার সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে দিল। ক্ষমতা কুক্ষিগত হল কাদের হাতে? প্রথমত পার্টির হাতে, তারপর কেন্দ্রীয় কমিটি ও শেষ পর্যন্ত পলিটব্যুরোর মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে। সেই সঙ্গে সঙ্গে পার্টি পরিচালিত পত্র-পত্রিকা ছাড়া সমস্ত রকম পত্র-পত্রিকা নিষিদ্ধ ঘোষিত হল। এমনকী ম্যাক্সিম গোর্কি সম্পাদিত পত্রিকাও। লেনিনের এক ঘোষণা বলে কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে কোনো রকম সমালোচনাও নিষিদ্ধ ঘোষিত হল।

এই সমস্ত নিষেধাজ্ঞার সাথে সাথে এক কথায় বলতে গেলে মার্কসবাদেরও কবর রচিত হল। কারণ, সমালোচনা, আত্মসমালোচনা ও যুক্তিতর্কের মধ্য দিয়েই একটা তত্ত্ব বা মতবাদ পরিশীলিত ও পরিমার্জিত হয়ে ধীরে ধীরে শুদ্ধতার দিকে অগ্রসর হয়। কাজেই তাকে সমালোচনার ঊর্ধ্বে বলে মেনে নেওয়া মানেই তার উন্নতির সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া। একটা প্রশ্ন অবশ্য থেকে যায় যে, মার্কসবাদের প্রবক্তারা সত্য সত্যই কি মার্কসবাদের প্রসার ও তার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি আন্তরিক ভাবে চান, নাকি শ্রমিকশ্রেণির নামে ক্ষমতা দখল করে সমাজকে শোষণ করতে চান? কিন্তু দুঃখের সঙ্গে হলেও বলতে হয় যে, আজ পর্যন্ত যেসব দেশে মার্কসবাদীরা ক্ষমতায় এসেছেন তার সব জায়গাতেই তারা সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির লক্ষ্যে মার্কসবাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করা এবং কি করে তাকে সমাজের পক্ষে সর্বাঙ্গীণভাবে কল্যাণকর করা যায় তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা, সে সব রাস্তায় যাননি। পরন্তু ক্ষমতা দখল করে এবং তাকে চূড়ান্তভাবে কুক্ষিগত করে স্বল্পমেয়াদি একটি দুর্নিবার শোষণযন্ত্রে পরিণত করার দিকেই অগ্রসর হয়েছেন। বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের মতে অভ্রান্ত সত্য বলে কিছু নেই। পারিপার্শ্বিকতা বদলে গেলে সত্যও বদল হতে বাধ্য। কাজেই বিশেষ কোনো স্বার্থসম্পন্ন লোকেরাই কেবল কোনো তত্ত্ব ও মতবাদকে অভ্রান্ত ও সমালোচনার ঊর্ধ্বে বলে দাবি করে থাকেন।

যাই হোক, যে শ্রেণিহীন সমাজ গঠনের উদ্দেশ্য নিয়ে রাশিয়ায় বিপ্লব হল এবং মার্কসবাদীরা ক্ষমতায় এলেন, সেই শ্রেণিহীন সমাজ সেখানে প্রতিষ্ঠিত হল না। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় সমাজ দেখা গেল মোটামুটি চারটি শ্রেণিতে ভাগ হয়ে গেছে। প্রথম শ্রেণিতে রইলেন মধ্যবিত্ত শোষকশ্রেণি, যারা পার্টির উচ্চপদে আসীন। দ্বিতীয়, পার্টির কাজের সমর্থনকারী তাঁবেদার শ্রেণি। তৃতীয় পার্টির কাজকর্মের বিরোধী শ্রেণি এবং চতুর্থ শ্রেণিতে রইলেন সাধারণ মানুষ। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধিই দ্বিতীয় তল্পিবাহক শ্রেণির উদ্দেশ্য। তৃতীয় শ্রেণি চিহ্নিত হল প্রতিক্রিয়াশীল বলে এবং তাদের জন্য তৈরি হল চরম নিষ্পেষণ যন্ত্র। গুপ্ত পুলিশ বাহিনী 'চেখা' এই শ্রেণির কত লোককে যে হত্যা করেছে তার কোনো হিসাব নেই। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, এ সব কিছুই চলতে থাকল শ্রমিক শ্রেণির নামে।

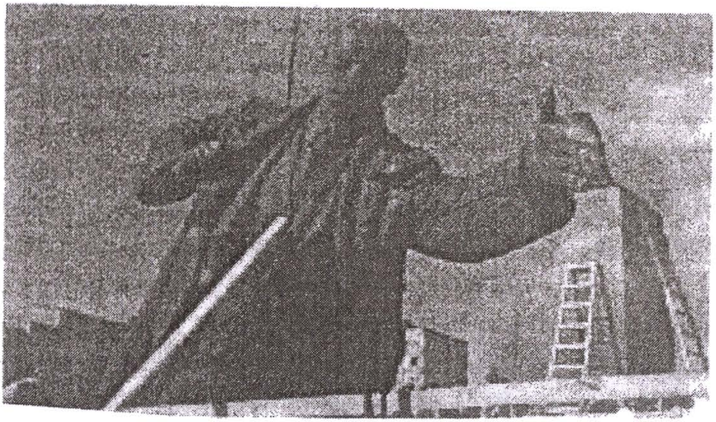
পুঁজিবাদী সমাজে মানুষ কাজ করে টাকার জন্য। কিন্তু সমাজবাদী ব্যবস্থায় সে তার সাধ্য অনুযায়ী কাজ করবে, কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছুই সমাজ থেকে গ্রহণ করবে না। মার্কস বললেন যে, তখন মানুষে মানুষে একটা অ-শত্রুতামূলক দ্বন্দ্ব স্থাপিত হবে এবং সে সমাজের জন্য প্রতিযোগিতামূলক ভাবে যত বেশি পারে দিতে চেষ্টা করবে। বিগত কোটি কোটি বছর ধরে, নানা রকম বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এককোষী প্রাণী থেকে আজকের মানুষের আবির্ভাব। বিবর্তন থেমে নেই, আপন গতিতে সে নীরবে কাজ করে চলেছে। কাজেই মানুষের মধ্যেকার হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থপরতা, জৈবিক আচার-আচরণ প্রভৃতি জান্তব প্রবৃত্তিগুলিও তার মধ্যে বিগত কোটি কোটি বছর ধরে সঞ্চারিত হয়ে চলেছে। অল্প কয়েক বছরের মধ্যে এগুলো রাতারাতি পরিবর্তিত হয়ে যাবে, এ এক অসম্ভব ব্যাপার। সব থেকে বড় কথা হল, গায়ের জোরে এগুলোকে কখনই তাড়ানো সম্ভব নয়।

তাই কৃষির সামাজিকীকরণের সময় স্তালিন যখন ডাক দিলেন যে, ভিজে কাপড় থেকে যেমন করে জল নিংড়ে ফেলতে হয় ঠিক তেমনি করে মানুষের মন থেকে সম্পত্তির মালিকানার মোহ ও ধর্মবিশ্বাস নিংড়ে ফেলতে হবে। কার্যত তা করা গেল না। জোর করে মানুষের গির্জায় যাওয়া বন্ধ করা হল, কিন্তু গির্জায় যাবার ইচ্ছাটা রোধ করা গেল না। জোর করে চাষির সম্পত্তিকে খামারে নিয়ে যাওয়া হল, চাষির জমিকে খামারের জমিতে পরিণত করা হল বটে, কিন্তু তার মন থেকে সম্পত্তির মালিকানার ইচ্ছাটা দূর করা গেল না। কাজেই তারা রাতারাতি, রাতের অন্ধকারে ভালো ভালো গরু, ছাগল, ভেড়া সব কেটে নুন মাখিয়ে বরফ চাপা দিয়ে রাখল। শুধু রুগ্ন ও অকাজের জন্তুজানোয়ারগুলোকেই খামারে দিয়ে আসল। আজকের রাশিয়ায় কৃষি, শিল্প প্রভৃতি সমস্ত ক্ষেত্রেই যে উৎপাদনের অপ্রতুলতা তার কারণও এই।

মার্কসবাদীরা গর্ব করে বলেন যে, সমস্ত দার্শনিকরা শুধু জগৎকে ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু একমাত্র মার্কসই জগৎকে ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে তাকে পরিবর্তন করার রাস্তাও বলে গেছেন। কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার মতে কোনো একটি ভৌততন্ত্র (Physical System) যদি সময়ের সাপেক্ষে অ-নিরবচ্ছিন্ন (Discontinuous) ভাবে পরিবর্তিত হয় তবে তা অবাস্তব। মনুষ্য জগতের ক্ষেত্রেও ওটা সমান ভাবে প্রযোজ্য। সমাজের একটা নিজস্ব গতি আছে এবং তাকে প্রাধান্য দিয়েই সমাজ বিবর্তনের কাজটা (continuous) হয়ে থাকে। অর্থাৎ, প্রচলিত সমাজ এবং পরিকল্পিত সমাজের মধ্যে বিচ্যুতি যেন খুব বেশি না হয়। এই নিরিখে বিচার করতে গেলে মার্কসের সমাজ বিবর্তনের তত্ত্ব একেবারেই অবাস্তব।

ডারউইনের বিবর্তনবাদের মূল চাবিকাঠিই হল, যে কোনো দুটি উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যেকার শারীরিক গঠন ও দৈহিক ক্ষমতার প্রভেদ। এই ব্যক্তিগত প্রভেদই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এককোষী জীবন থেকে এক অসংখ্য রকমের প্রাণী ও উদ্ভিদের সৃষ্টি করেছে। যত সূক্ষ্মই হোক না কেন, এই প্রভেদ মানুষে মানুষে বিদ্যমান রয়েছে এবং চিরকাল থাকবে। কাজেই মানুষে মানুষে সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য যে সমাজই গঠন করা হোক না কেন, ব্যক্তিগত প্রভেদের জন্য কিছু সংখ্যক মানুষ, তাকে গায়ের জোরেই হোক বা বুদ্ধির জোরেই হোক, কিছু বাড়তি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেই। একে রোধ করার কোনো উপায় নেই। কাজেই প্রকৃত শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করাও অসম্ভব।

মার্কসবাদের সর্বাপেক্ষা প্রধান ত্রুটি হল, মানুষের মনের বা তার মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলোর সামান্যতম সংস্থানও এতে নেই। খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান মানুষের বেঁচে থাকার পক্ষে অপরিহার্য, এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু শুধু এই জৈবিক প্রয়োজনগুলো মিটে গেলেই মনে হয় মানুষ মানুষের মত বেঁচে থাকতে পারে না। মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকতে গেলে তার আরও অনেক কিছুরই প্রয়োজন। মার্কসবাদে যার কোনো সংস্থান নেই। রাশিয়ায় মার্কসবাদী সরকারকে ক্ষমতায় আসীন রাখার জন্য এবং এর শত্রুদের ঠেকাবার জন্য দমনপীড়ন হয়তো নিতান্তই অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এতে করে মানুষের বাক্-স্বাধীনতায় এতটা হস্তক্ষেপ করা হল যে একটা শ্বাসরোধকারী অবস্থার সৃষ্টি হল। পার্টি ও তার নেতাদের শুধু প্রশংসাই করা যাবে, কোনো রকম সমালোচনা করা যাবে না। কাজেই আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এমন কী স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও একটা প্রাণখোলা কথাবার্তা বা আলাপ-আলোচনার দ্বার বন্ধ হয়ে গেল। শুধু এই শ্বাসরোধকারী অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার জন্যই কাতারে কাতারে মানুষ পূর্ব জার্মানী থেকে পশ্চিম জার্মানীতে পালাতে শুরু করেছিল অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের জন্য নয়। অথচ মার্কসবাদ যা করতে চেয়েছিল বা যা করবে বলে ঘোষণা করেছিল, কার্যক্ষেত্রে সেই খেটে খাওয়া মানুষের স্বর্গ গড়তে পারলে উল্টো ঘটনা ঘটাই স্বাভাবিক ছিল।



মার্কসবাদীতত্ত্ব ও মার্কসবাদী সমাজতন্ত্রের প্রতি বীতশ্রদ্ধ
রাশিয়ার মানুষ লেনিনের মূর্তি ভেঙে ফেলছে।

বারট্রান্ড রাসেলের মতে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যক্তির উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ থাকার দরকার আছে বটে, তবে তা খুবই সীমিত থাকা উচিত। ব্যক্তির উপর রাষ্ট্রের অধিক নিয়ন্ত্রণ মানুষের

মনকে অবদমিত করে, চিন্তার জগতে বাধা সৃষ্টি করে। রূপকথার গল্প অবাস্তব ও অবৈজ্ঞানিক বলে শিশুদের কাছ থেকে তা কেড়ে নেওয়া যেতে পারে। তবে এতে দেখা যাবে যে তাদের মধ্যে কল্পনা প্রবণতা ভীষণভাবে হ্রাস পেয়ে গেছে, যা নতুন কিছু সৃষ্টির পক্ষে একান্ত আবশ্যক। যে সমস্ত ক্ষণজন্মা পুরুষ, কি শিল্পে, কি সাহিত্যে, কি বিজ্ঞানে মনুষ্য জাতির জন্য যুগান্তকারী কিছু রেখে গেছেন, দৈনন্দিন আচার-আচরণে তাদের অনেকেই ছিলেন সাধারণের থেকে একটু ভিন্ন প্রকৃতির। কাজেই, সকল মানুষকে একই রাস্তায় চলতে বাধ্য করার মাধ্যমে চিন্তার জগতে অপূরণীয় ক্ষতির যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। জুয়া খেলা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর বলে বন্ধ করে দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু সৃষ্টিশীল মানুষদের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে তাঁদের অনেকেই জুয়া খেলতেন।

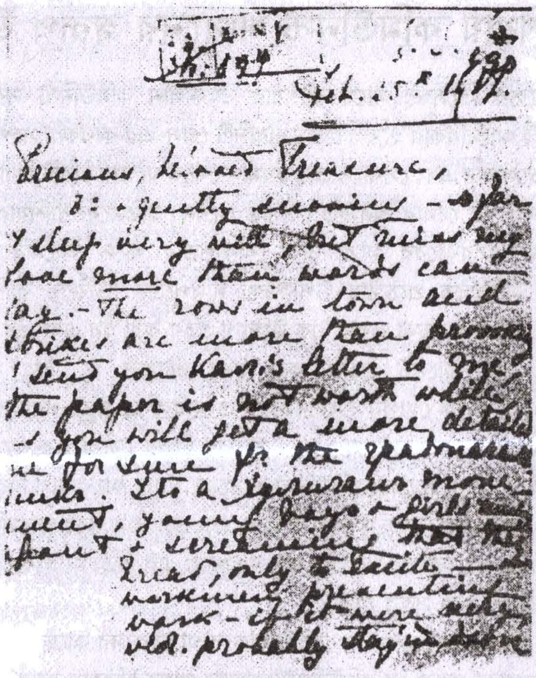
শেষ কথা হিসাবে বলা যায় যে, মার্কসবাদের বিকল্প বা পরিশীলিত মার্কসবাদ বলে কোনো তত্ত্ব যদি কেউ ভবিষ্যতে সমাজে প্রয়োগের কথা বলেন, তাহলে প্রথমেই দেখতে হবে যে সেই তত্ত্ব ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের কথা বলছে কি-না। যদি বলে তাহলে আর কিছু না দেখেই তাকে বর্জন করতে হবে। দ্বিতীয়ত, দেখতে হবে যে সেই তত্ত্বে প্রচলিত সমাজ এবং পরিকল্পিত সমাজের মধ্যে কতটা বিচ্যুতি রয়েছে। মাত্রাতিরিক্ত বিচ্যুতি মানেই ব্যক্তির উপর রাষ্ট্রের মাত্রাতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ এবং তাকে বর্জন করতে হবে। তৃতীয়ত, দেখতে হবে যে, যে দেশের মানব সমাজে তা প্রয়োগের কথা বলা হচ্ছে, ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু ইত্যাদির দ্বারা প্রভাবিত যে মানব সভ্যতার পরম্পরা সেই দেশে চলে আসছে, এই নতুন তত্ত্বের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য আছে কি-না।

রাশিয়ায় কমিউনিস্ট শাসনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন

১৯৯১ সালের ডিসেম্বর মাসে রাশিয়ার তৎকালীন কমিউনিস্ট সরকারের পতনের অব্যবহিত পরেই আমেরিকার ইয়েল ইউনিভারসিটি প্রেস-এর কার্যকরী সম্পাদক শ্রীজোনাথন ব্রেন্ট রাশিয়ায় চলে যান এবং সেখানে প্রায় ছয়মাস থেকে মস্কোর চারটি প্রধান মহাফেজখানার (Archive)-র নথিপত্র দেখার অনুমতি যোগাড় করেন। ইতিমধ্যে রাশিয়ার বর্তমান সরকার এবং আমেরিকার সরকারের মধ্যে এক বোঝাপড়ার ফলে আমেরিকান ও রাশিয়ান ঐতিহাসিকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উপরিউক্ত নথিপত্রের ভিত্তিতে রাশিয়ায় কমিউনিস্ট আমলের প্রকৃত ইতিহাস রচনা করার এক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং এই কাজের জন্য দশ লক্ষ ডলারের এক বাজেট তৈরি করা হয়। শ্রীব্রেন্ট ও তাঁর সহকর্মিগণ উক্ত মহাফেজখানাগুলো থেকে গোপন তথ্যাদি সম্বলিত ফাইলপত্র প্রচুর পরিমাণে উদ্ধার করেন। আশা করা হচ্ছে যে, ঐ সব ফাইলে ১৯১৭ সালের বিপ্লব থেকে শুরু করে ১৯৯১ সালের পতন পর্যন্ত এই দীর্ঘ ৭৪ বছরের কমিউনিস্ট শাসনের সমস্ত কার্যকলাপ বিবৃত রয়েছে। এখন পর্যন্ত প্রায় ২৫ কোটি ফাইল উদ্ধার করা হয়েছে এবং এর প্রায় সবই আমেরিকায় নিয়ে আসা হয়েছে। সম্ভবত ১৯৯৯ সালের মধ্যেই মোট ৪৫ খণ্ডে এই ইতিহাস ইংরাজী ও রাশিয়ান এই দুই ভাষাতেই প্রকাশ করা সম্ভব হবে।

উপরিউক্ত দলিল দস্তাবেজগুলো যে ইতিহাসের গবেষকদের কাছে এক অমূল্য সম্পদ তা বলাই বাহুল্য। এগুলো থেকে যে কমিউনিস্ট জমানার প্রকৃত ইতিহাস জানা যাবে শুধু তাই নয়, কমিউনিস্টদের মিথ্যা প্রচার আসল ইতিহাসকে যে কতখানি বিকৃত করেছে তাও বোঝা যাবে। গত ১৯৯৫ সালে ইয়েল ইউনিভারসিটি প্রেস 'The Fall of Romanovs' বা রোমানভ বংশের পতন নামে একটি খণ্ড প্রকাশ করে। এতে ১৯১৭ সালের বিপ্লবের কিছু তথ্য ও সপরিবারে জার দ্বিতীয় নিকোলাস-এর হত্যার বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। গত বছর প্রকাশ করা হয়েছে সম্রাজ্ঞী আলেকজান্দ্রার ডায়েরি। কিশোরী বয়স থেকেই আলেকজান্দ্রা নিয়মিত ডায়েরি লিখতেন। এতে তাঁর জীবনের সুখ-দুঃখ, প্রেম, পরিণয় সব কিছুই স্থান পেয়েছে। বিপ্লবের সময়কার রাজনৈতিক ডামাডোলের মধ্যে তিনি যে-সব মনোবেদনার শিকার হয়েছিলেন তাও তিনি ডায়েরির পাতায় লিখে রেখে গেছেন। গত ১৯১৮ সালের জুলাই মাসের মাঝামাঝি কোনো একদিন তিনি তাঁর ডায়েরিতে শেষ লেখা লেখেন এবং ঐতিহাসিকদের বিশ্বাস এর কয়েক ঘণ্টা পরই রাজপরিবারকে হত্যা করা হয়।

জার দ্বিতীয় নিকোলাস ছিলেন একজন অতিশয় মার্জিত, নম্র ও স্বল্পভাষী ভদ্রলোক। ১৯১৭ সালের বিপ্লব শুরু হলে তিনি স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করে নিঃশব্দে 'তবলস্ক' নামক স্থানে স্বেচ্ছা নির্বাসনে চলে যান। পরে রাজপরিবারকে 'লালর উরাল' নামে পরিচিত উরাল অঞ্চলের পার্টি কমিটির কট্টর নেতাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এরা রাজপরিবারকে ইয়েকাতেরিনবার্গ নামক স্থানে নিয়ে যায় ও একটা বাড়িতে গৃহবন্দী করে রাখে। অন্তিম দিনে হত্যাকারীদলের পুরোধা ইয়াকভ ইউরোভস্কি রাত দুটোর সময় সবাইকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলে এবং সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে বলে। জার নিজে রক্তাল্পতা রোগে আক্রান্ত



রানী আলেকজান্দ্রার ডায়েরির একটি পাতা

তাঁর শিশুপুত্রকে কোলে করে নামতে থাকেন। তারপর স্ত্রী আলেকজান্দ্রা, চার মেয়ে ও পরিবারের চারজন পোষ্য সমেত ১১ জনের দলটি অগ্রসর হতে থাকে। নিচে নেমে একটা উঠান পেরিয়ে এক ছোট ও স্বল্পালোকিত কক্ষে তাদের সমবেত করানো হয় এবং গ্রুপ ফটো তোলার ভঙ্গীতে দরজার দিকে মুখ করে সাজানো হয়।

ইতিমধ্যে মূর্তিমান যমের মত ১২ জনের হত্যাকারী দলটি বন্দুক হাতে উপস্থিত হয় ও দরজায় দাঁড়িয়ে গুলি করতে শুরু করে। মুহূর্তের মধ্যে সেই ছোট কক্ষটি বারুদের ধোঁয়া, রক্ত ও আর্তনাদে এক নরকে পর্যবসিত হয়। যারা বেঁচেছিল ও গোঙাচ্ছিল তাদের বন্দুকের কুঁদো দিয়ে মেরে বা বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে স্তব্ধ করে দেওয়া হয়। অতঃপর ইউরোভস্কি সকলের নাড়ি টিপে মৃত্যু সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে স্থান ত্যাগ করে। সমস্ত ঘটনাটা ঘটতে প্রায় মিনিট কুড়ি সময় লেগেছিল।

বিগত ৭০ বছর ধরে রাশিয়ার কমিউনিস্ট সরকার সকলকে এই বানানো গল্প শুনিয়ে আসছিল যে, উরাল পার্টি কমিটির অত্যুৎসাহী কয়েক জন সদস্য কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদন ছাড়াই রাজপরিবারকে হত্যা করে। ১৯৬৬ সালে এডোয়ার্দ রাজিনস্কি নামে একজন ইতিহাসের ছাত্র প্রকৃত সত্য উদঘাটন করার উদ্দেশ্যে মস্কোর বিখ্যাত ঐতিহাসিক মহাফেজখানার গোপন কাগজপত্র ঘেঁটে দেখার জন্য সরকারের অনুমতি প্রার্থনা করে। সৌভাগ্যক্রমে গর্বাচভের পেরেস্ত্রৈকা সে সুযোগ এনে দেয়। রাজিনস্কি ঐ মহাফেজখানার নথিপত্রের মধ্যে একখানা টেলিগ্রাম আবিষ্কার করেন যা রাজহত্যার ঠিক আগের দিন উরাল



রাশিয়ার রাজপরিবার : জার নিকোলাস, (বাঁয়ে) রানী আলেকজান্দ্রা, চার মেয়ে (বাঁ দিক থেকে) মেরী, তাতিয়ানা, ওল্‌গা ও অ্যানাস্তাসিয়া এবং ছেলে আলেক্সি।

পার্টি কমিটি লেনিনকে পাঠিয়েছিল। ঐ টেলিগ্রামের মর্ম ছিল "We cannot wait, if your opinion is contrary, inform immediately"—অর্থাৎ আমাদের পক্ষে আর বিলম্ব করা সম্ভব হচ্ছে না। ইতিমধ্যে (রাজপরিবারকে হত্যা করার ব্যাপারে) আপনার সিদ্ধান্তের পরিবর্তন হলে শীঘ্র জানান। ঐ সময় অর্থাৎ ১৯১৮ সালে, ক্রেমলিনে লেনিনের ব্যক্তিগত দেহরক্ষী হিসাবে কাজ করতেন আলেক্সি আকিমভ নামে এক ব্যক্তি। এই আলেক্সির বয়ান অনুসারে ঐ টেলিগ্রাম পাবার পর সেই দিনই ক্রেমলিন থেকে টেলিগ্রাম পাঠানো হয় এবং হত্যার অনুমতি দেওয়া হয়।

রাজিনস্কি তাঁর আবিষ্কৃত তথ্যের ভিত্তিতে একখানি নাটক লেখেন, সেই নাটক মঞ্চস্থ হবার পর একদিন এক রহস্যময় ব্যক্তি তাঁর সাথে দেখা করে জানায় যে, ঐ ১১ জনের মধ্যে দু'জন বেঁচে গিয়েছিল। উপরন্তু ঐ দুজনের মধ্যে একজন ছিল জারের পুত্র আলেক্সি নিকোলায়েভিচ। রাজিনস্কি এ সংবাদ কোনো মতেই বিশ্বাস করতে পারলেন না। পরে তাঁর কিছুটা বিশ্বাস জন্মালো যখন তিনি তৎকালীন অপরাধী শিবিরের একজন কয়েদির সঙ্গে আলেক্সির আশ্চর্যজনক মিল খুঁজে পেলেন। সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার হল এই যে, সোভিয়েত সরকারের পতনের পর ১৯৯৩ সালে, যখন করবস্থান খোঁড়া হল তখন দেখা গেল যে সেখানে ১১টির বদলে মাত্র ৯টি কঙ্কাল রয়েছে। তবে সুখের কথা হল এই যে ইয়েল ইউনিভারসিটি প্রেস দ্বারা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস প্রকাশিত হলে এই সব নিষ্ঠুর ঘটনাবলীর আরও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া সম্ভব হবে।

যাইহোক, ইয়েল ইউনিভারসিটি প্রেস ইতিমধ্যে "Stalin's Letters to Molotov" বা 'মলোটভকে লেখা স্ট্যালিনের পত্রাবলী' নামে আরও একখানা গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। আমেরিকার বিশিষ্ট স্ট্যালিন বিশেষজ্ঞ রবার্ট কঙকেস্ট-এর মতে ঐ গ্রন্থের মধ্য দিয়ে কমিউনিস্ট মতবাদের ক্রূরতা ও নিষ্ঠুরতা অত্যন্ত নগ্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, উক্ত গ্রন্থে স্ট্যালিনের হৃদয়হীন খুনী চরিত্রটাও খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। সাধারণভাবে লোকে এটা মনে করে যে, স্ট্যালিন একজন নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন শীতল খুনি (icy executor) ছিলেন বটে, তবে লেনিন অতটা নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন ছিলেন না। কিন্তু লেনিনের ব্যক্তিগত ও গুপ্ত মহাফেজখানা থেকে যে সব দলিল উদ্ধার করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলছে। বর্তমানে হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক রিচার্ড পাইপস্ তাঁর রাশিয়ান ছাত্র ইউরি বুরানভ-এর সাহায্যে ঐ সমস্ত তথ্য পুস্তকাকারে গ্রথিত করার কাজ করছেন। এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে অধ্যাপক পাইপস্ বলেন যে, প্রথমদিকে তিনি ঐ সমস্ত দস্তাবেজের মধ্যে লেনিনের মানবিক দিকগুলোই অন্বেষণ করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে, লেনিন স্ট্যালিনের থেকেও বেশি নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন ছিলেন।

উপরিউক্ত ৪৫টি খণ্ডে থাকবে ১৯৩০ দশকের কৃষি-সমবায়ীকরণের সময়কার ঘটনাবলীও। প্রাথমিকভাবে দেখা যায় যে, ঐ সময় সমবায়ীকরণের বিরোধী কৃষকদের ঘৃণ্য দেশদ্রোহী ও বিপ্লব-বিরোধী শ্বেত সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দিয়ে 'গুলাগ' নামে পরিচিত শ্রম-শিবির (Labour Camp)-গুলোতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং শেষ পর্যন্ত হত্যা করা হয়। উক্ত প্রাথমিক সমীক্ষায় এটাও দেখা যায় যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সারা পৃথিবীতে যত প্রাণহানি হয়েছিল তার থেকেও বেশি সংখ্যক ইউক্রেনের চাষিকে ঐ দশ বছরের মধ্যে হত্যা করা হয়েছিল।

উক্ত প্রকাশনা কাজের সহঃসম্পাদক শ্রীভ্লাদিমির কোজলভ-এর মতে অক্টোবর বিপ্লব নামে খ্যাত ১৯১৭ সালের বিপ্লব মোটেও জনগণের বিপ্লব ছিল না এবং রাশিয়ার সিকিভাগ মানুষও ঐ বিপ্লবকে সমর্থন করেনি। তাঁর মতে ক্রুশ্চেভ ও ব্রেজনেভ-এর আমল থেকেই রাশিয়ার মানুষ কমিউনিস্ট সরকার ও কমিউনিস্ট মতবাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে এবং এই কারণেই গর্ভাচভের আমলে গ্লসনস্ত ও পেরেস্ত্রৈকার মাধ্যমে মানুষকে তার ব্যক্তিস্বাধীনতা ও বাক্‌স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিতে হয়। অধ্যাপক ব্রেন্ট ও অন্যান্যদের মতে যে সমস্ত প্রাদেশিক মহাফেজখানাগুলোতে এখনও হাত পড়েনি, সেগুলো থেকে গায়ের রক্ত হিম করা আরও অনেক ভয়ংকর তথ্যের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। বর্তমানে পূর্ব জার্মানী ও পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য প্রাক্তন কমিউনিস্ট দেশগুলোর মহাফেজখানায় রক্ষিত তথ্যাবলীও জনসমক্ষে আনার প্রচেষ্টা চলছে।

ব্যক্তি স্বাধীনতা ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার ওপর চিনা কমিউনিস্ট সরকারের আসুরিক দমন-পীড়ন

চিনের সরকারি সংবাদ সংস্থা 'জিনহুয়া'-র খবর অনুসারে গত ২৩শে জানুয়ারি (২০০১ খ্রিঃ) বেজিং শহরের তিয়া-নান্-মেন্ স্কোয়ারে ফালুন-গঙ মতাদর্শে বিশ্বাসী পাঁচজন সদস্য গায়ে আগুন দিয়ে আত্মাহুতির চেষ্টা করে। ওই দিন বেলা প্রায় ২টা ৪০ মিনিটে চারজন মহিলা ও একজন পুরুষ সদস্য গায়ে পেট্রল ঢেলে আগুন দেয়। একজন মহিলার ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় এবং বাকিদের পুলিশ উদ্ধার করে। বিগত প্রায় দেড় বছর ধরে চিন-সরকার তাদের ওপর যে দমন-পীড়ন চালিয়ে আসছে তার প্রতি ধিক্কার জানাতে এবং বিশ্বের স্বাধীনতাপ্রেমী মানুষের সহানুভূতি আদায় করতেই যে তাঁরা আত্মোৎসর্গের এই করুণ পথ বেছে নিয়েছিলেন তা বলাই বাহুল্য।

এর ঠিক দশদিন আগে, গত ১৩ই জানুয়ারি, প্রায় ২০ হাজার ফালুন-গঙ সদস্য হংকং-এর ভিক্টোরিয়া পার্কে সমবেত হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানায়। এর পর তারা হংকং-এর সিটি হল-এ এক সভা করে। সেই সভায় তারা ফালুন-গঙের ওপর থেকে সরকারি নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবার দাবি জানায় এবং তাদের প্রতি অন্যায় জুলুম বন্ধ করতে রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার কমিশনের হস্তক্ষেপ দাবি করে। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, ফালুন-গঙ শরীরচর্চা চিনের মূল ভূখণ্ডে নিষিদ্ধ হলেও হংকং-এ তা এখনও নিষিদ্ধ নয়।

তবে গত ১৩ই জানুয়ারির ঘটনা চিনা নেতাদের যে ক্ষিপ্ত করে তুলেছে তাতে কোনই সন্দেহ নেই। তাই হংকং-এর অনুগত আমলাগোষ্ঠীর কাছে ইতিমধ্যে এক গোপন নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, সেখানে ফালুন-গঙের কার্যকলাপ যেন যে কোনো ভাবে বন্ধ করার চেষ্টা করা হয়। এই নির্দেশের ফলেই হংকং-এর সর্বোচ্চ আমলা, চিফ এক্সিকিউটিভ শ্রী টুং চি হোয়া সম্প্রতি ঘোষণা করেন যে, ফালুন-গঙ হল এক রকমের ডাকিনী বিদ্যা। অপর দিকে প্রকাশ্যে ফালুন-গঙের নিন্দা করতে অসম্মত হবার ফলে আরেক উচ্চপদস্থ আমলা শ্রী আন-সন্ চান্-কে পদচ্যুত করা হয়। এই সমস্ত ঘটনা থেকে বিশেষজ্ঞদের অনুমান যে, খুব শীঘ্রই ফালুন-গঙ শরীরচর্চা হংকং-য়েও নিষিদ্ধ ঘোষিত হবে।

প্রকৃতপক্ষে ফালুন-গঙ হল শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের সাথে সাথে বিশেষভাবে হাত-পা চালিয়ে এক প্রকার শরীরচর্চা। এর ফলে শরীর স্বাস্থ্য ভাল হয় এবং সেই সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তি, মনোবৃত্তি ও আধ্যাত্মিক চেতনারও উন্নতি হয়। এই শরীরচর্চার উদ্ভাবকের নাম শ্রী লি হোংঝি। গত ১৯৯৪ থেকে তিনি আমেরিকার নিউ ইয়র্কের বাসিন্দা। এই বিষয়ের ওপর শ্রী লি অনেক পুস্তকও রচনা করেছেন। শ্রী লি-র মতে এই শরীরচর্চা যে নিষ্ঠা সহকারে করবে তার মনে এক দিব্য প্রশান্তি আসবে এবং সে সম্পূর্ণ ভয়শূন্য হবে। কিন্তু চিনের কমিউনিস্ট নেতাদের মতে এটা এক রকমের হাতুড়ে ডাইনী-বিদ্যা মাত্র এবং সমাজের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর।

বাস্তবিক পক্ষে মার্কসবাদ হল সম্পূর্ণ বস্তুবাদী এবং কঠোরভাবে নিরীশ্বরবাদী এক আসুরিক তত্ত্ব। ভারতীয় দৃষ্টিকোণ অনুসারে এ হল এক 'শিশ্নোদর' (শিশ্ন + উদর) তত্ত্ব। অর্থাৎ যে তত্ত্ব আহার ও মৈথুনকেই একমাত্র বিবেচ্য জ্ঞান করে এবং যার সমস্ত আলোচনাই আহার ও মৈথুনে সীমাবদ্ধ। তাই আধ্যাত্মিকতা ও ঈশ্বরবিশ্বাসের লেশমাত্র স্থানও মার্কসবাদে নেই। মহাপণ্ডিত মার্কস বলে গিয়েছেন যে, ধর্মবিশ্বাস হল আফিম। কাজেই দুনিয়ার সমস্ত মার্কসবাদীর প্রাথমিক কর্তব্য হল ধর্মবিশ্বাস, ঈশ্বরবিশ্বাস ইত্যাদিকে আফিমের ন্যায় বর্জন করা।

তাই ১৯৩০-এর দশকে কৃষির রাষ্ট্রীয়করণের সময় রাশিয়ার মহান কমিউনিস্ট নেতা যোসেফ স্ট্যালিন ডাক দিলেন যে, ভেজা কাপড় থেকে লোকে যেমন করে জল নিংড়ে ফেলে, চাষিদের মন থেকেও ঠিক সেইভাবে ব্যক্তিগত মালিকানার মোহ ও ধর্মবিশ্বাসকে নিংড়ে ফেলতে হবে। এই মহান নির্দেশকে কার্যে পরিণত করার জন্য মস্কো ও লেনিনগ্রাডের কলকারখানাগুলো থেকে বেছে নেওয়া হল অত্যন্ত অনুগত ২০,০০০ শ্রমিক এবং 'টুয়েন্টি থাউসেন্ডার' নামে পরিচিত এই শ্রমিকদের গ্রামে গ্রামে পাঠিয়ে দেওয়া হল সমবায় কৃষি খামার গড়ে তুলতে চাষিদের সাহায্য করার জন্য।

এই 'টুয়েন্টি থাউসেন্ডার'-এর দল কি করে চাষিদের জমি-জায়গা, গোরু-বলদ, হাঁস মুরগী, সব গায়ের জোরে কেড়ে নিয়ে কৃষি-খামার গড়ে তুলল তা প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রী মিখাইল শলোকভ তাঁর 'Virgin Soil Upturned' উপন্যাসে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। তার থেকেও বড় কথা হল, ওই 'টুয়েন্টি থাউসেন্ডার'-রা কি করে গায়ের জোরে, অত্যাচার উৎপীড়নের দ্বারা চাষিদের গির্জায় যাওয়া বন্ধ করেছিল এবং গির্জার দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়েছিল, তাও মিখাইল শলোকভ সুন্দরভাবে বর্ণনা করে গিয়েছেন।

যেসব চাষি এ সব দানবীয় কাজের সামান্যতম বিরুদ্ধাচরণ করল, ওই 'টুয়েন্টি থাউসেন্ডার-এর দল তাদের চিহ্নিত করল শ্রেণিশত্রু বা শ্বেত-সন্ত্রাসবাদী হিসাবে। এবং শেষ পর্যন্ত তাদের চালান করে দেওয়া হল 'গুলাগ' নামে পরিচিত সাইবেরিয়ার শ্রম-শিবিরগুলোতে। নামে শ্রম-শিবির হলেও সেগুলো ছিল কসাইখানা। লক্ষ লক্ষ চাষিকে সেখানে হত্যা করা হয় এবং মৃতদেহ গায়েব করে ফেলা হয়। এটাই কমিউনিস্টদের কাজের ধরন। গোলমাল সৃষ্টিকারী, বিরোধী মত পোষণকারীদের এই দুনিয়া থেকে চিরকালের মত উধাও করে দাও।

স্ট্যালিনের সময় গুলি করে কিংবা গ্যাসচেম্বারে মেরে গণকবর দেওয়া কিংবা সাইবেরিয়ার বনে ছেড়ে দিয়ে আসাটাই ছিল স্বীকৃত মার্কসীয় পদ্ধতি। কিন্তু বিশাল বিশাল জেট প্লেনের আবিষ্কার আজ এই সব দানবীয় কাজে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিয়েছে। ৪০০/৫০০ লোককে প্লেনে করে নিয়ে গিয়ে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় মাঝ সমুদ্রে ঠেলে ফেলে দেওয়াই হয়েছে আজকের উন্নত ও বৈজ্ঞানিক মার্কসীয় পদ্ধতি। বিশেষজ্ঞদের অনুমান আজকের চিনে এই সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিই ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং এই পদ্ধতি অনুসরণ করেই বেশ কয়েক হাজার ফালুন-গঙ কর্মকর্তাকে উধাও করা হয়েছে।

তবে মনীষা মুখার্জী, ভিখারী পাশোয়ান এবং অতি সম্প্রতি মেদিনীপুর জেলার ছোট আঙাড়িয়া গ্রামের ১৮ জন গ্রামবাসীর মৃতদেহ উধাও করতে আমাদের মার্কসবাদীরা কোন্ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন তা এখনও জানা যায়নি। সব থেকে মজার কথা হল, এই সব নৃশংস বর্বর, শীতল খুনিদের নেতা, আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তাঁর রাজনৈতিক বিরোধীদের প্রায়শই 'বর্বর' বলে গালি দিতেন। অথচ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, গীতার ১৬শ অধ্যায়ে অসুর প্রকৃতির লোকের মধ্যে যত রকমের সম্ভাব্য বর্বরতা ও বদগুণের কথা বলা আছে, তার সবগুলোই ওই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে সম্ভবত ছিল।

তবে ভাগ্যের কথা হল এই যে, আমাদেরই দেশে একটা কেন্দ্রীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় সংবিধানের অস্তিত্ব রয়েছে। তা না হলে বিগত ৩৩ বছরের রাজত্বকালে আমাদের মার্কসবাদীরা যে লক্ষ লক্ষ মনীষা ও লক্ষ লক্ষ ভিখারী পাশোয়ানকে চিরকালের জন্য বেমালুম উধাও করে ফেলতো তাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। 'গণশক্তি' ছাড়া আর সব খবরের কাগজ তখন নিষিদ্ধ হত এবং এসব কোনো খবরই 'গণশক্তি'-তে প্রকাশিত হত না।

যাই হোক, স্ট্যালিন তার দমন-পীড়নের দ্বারা রাশিয়ার মানুষের গির্জায় যাওয়া বন্ধ করলেন বটে, কিন্তু তাদের মন থেকে ধর্ম-বিশ্বাস নিংড়ে বার করতে পারলেন না। সোভিয়েট সংঘের পতনের সঙ্গে সঙ্গে আবার তারা দলে দলে গির্জায় যেতে শুরু করল। বহুদিন অব্যবহারের ফলে গির্জাগুলো জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছিল। তারা মেরামত করে আবার সেগুলোকে সুন্দর করে তুলল।

রাশিয়ায় বহু কৃষ্ণভক্ত আছেন। আজ মস্কো সহ রাশিয়ার বড় বড় শহরগুলিতে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এতদিন তাদের গোপনে কৃষ্ণনাম করতে হত এবং কমিউনিস্ট সরকার জানতে পারলে জেলে ঢুকিয়ে দিত। কিন্তু আজ আর সে ভয় নেই। কৃষ্ণভক্তরা এখন প্রকাশ্যেই ধর্মাচরণ করতে পারছেন।

এসব ঘটনা এটাই প্রমাণ করে যে, ভিজে কাপড় থেকে জল নিংড়ে ফেলার মত গায়ের জোরে মানুষের মন থেকে ধর্মবিশ্বাস ও আধ্যাত্মিকতা নিংড়ে ফেলা যায় না। আমি কে? কেনই বা এই জগতে এসেছি? কোথা থেকে এসেছি এবং মৃত্যুর পর আবার কোথায় যাব? এই সব চিরন্তন প্রশ্ন মানুষ করবেই এবং গায়ের জোরে তা বন্ধ করা সম্ভব নয়।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল, ইতর প্রাণীরা এই সব প্রশ্ন করে কাউকে বিব্রত করে না। কাজেই বলা চলে যে, মার্কসবাদের উদ্দেশ্য হল মানুষকে ইতর পশুতে পরিণত করা এবং মনুষ্য সমাজকে এক পশুর সমাজে পরিণত করা। মানুষ খাবে দাবে, মৈথুন করবে আর সুখে নিদ্রা যাবে। পার্টি তাদের যেমনভাবে চলতে বলবে, তারা সেই ভাবেই চলবে।পার্টি তাদের যেভাবে ভাবতে বলবে, তারা শুধু সেভাবেই ভাববে। মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতা বলে কিছু থাকবে না। মনুষ্য সমাজ হবে শৃঙ্খলিত এক পশুর সমাজ। শৃঙ্খল থাকবে পার্টির হাতে। যে এই কঠোর নিয়মের বিন্দুমাত্র উল্লঙঘন করবে, সে-ই হবে ঘৃণিত শ্রেণিশত্রু, বিপ্লবের শত্রু এবং বধযোগ্য।

প্রকৃত সত্য হল, মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতা, বাক্‌স্বাধীনতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা স্বীকার করলে মার্কসবাদী তত্ত্বই লুপ্ত হবে। কমিউনিস্ট সরকার বা শ্রমিকশ্রেণির একনায়কতন্ত্র তাসের ঘরের মতই ভেঙে পড়বে। এই কারণেই চিনের মার্কসবাদী সরকার তিব্বতের বৌদ্ধদের নানাভাবে উৎপীড়ন করে চলেছে। সেখানকার বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালাচ্ছে, তাদের হত্যা করছে। এই কারণেই চিনের মার্কসবাদী সরকার ১৯৮৯ সালের ৪ঠা জুন, তিয়া-নান্ মেন চত্বরে হাজার হাজার গণতন্ত্রকামী ছাত্রকে মেশিন-গান দিয়ে গুলে করে এবং ট্যাঙ্ক দিয়ে পিষে এক পৈশাচিক নরমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিল। এবং এই কারণেই গত ১৯৯৯ সালের ২২শে জুলাই চিনের কমিউনিস্ট সরকার ফালুন-গঙ আধ্যাত্মিক শরীরচর্চাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং তার অনুসরণকারীদের ওপর বর্বর দমন-পীড়ন শুরু করেছে।

চিনা 'ফালুন-গঙ' শব্দ দুটোর আক্ষরিক অর্থ হল, "শ্বসন-চক্রকে উদ্দীপিত করার নিয়ম-কানুন।" অনেক কাল আগে থেকেই চিনে কী-গঙ নামে এক প্রকার শরীরচর্চার প্রচলন ছিল এবং আজকের ফালুন-গঙ হল সেই কী-গঙেরই এক নতুন সংস্করণ। আগেই বলা হয়েছে যে, প্রায় ৫০ বছর বয়সি লি হোংঝি নামে এক ব্যক্তি এই উন্নত পদ্ধতির উদ্ভাবক। পৃথিবীর সমস্ত ফালুন-গঙ সদস্যই শ্রী লি-কে গুরু বলে মান্য করে। ফালুন-গঙের মূল তত্ত্ব বলছে যে, প্রত্যেক মানুষেরই তলপেটে রয়েছে এক শক্তি-চক্র, যা সাধারণত সুপ্ত অবস্থায় থাকে। বিশেষ ধরনের কিছু শরীরচর্চা ও শ্বাস প্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণ অভ্যাসের দ্বারা এই শক্তি-চক্রকে উদ্দীপিত করা সম্ভব। এই চক্র তখন ঘুরতে থাকে এবং সেই ব্যক্তির মধ্যে এক আধ্যাত্মিক শক্তি প্রকাশ পায়। তখন সে হয় সম্পূর্ণ নির্ভীক এবং লাভ করে পরম এক মানসিক শান্তি।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, উপরিউক্ত তত্ত্বের সঙ্গে ভারতীয় কুণ্ডলিনী তত্ত্বের বিশেষ সাদৃশ্য রয়েছে। ভারতীয় রাজযোগের তত্ত্বও আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান বা এক কথায় নানাবিধ যৌগিক প্রক্রিয়ার দ্বারা সুপ্ত কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করার কথা বলে। তাই বর্তমান লেখকের অনুমান যে, কী-গঙ নামে পরিচিত সাবেক চিনা শরীরচর্চা ভারত থেকেই চিনে গিয়েছিল। এটা খুবই স্বাভাবিক যে, ভারতের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা কুংফু ও কারাটে নামে পরিচিত ভারতীয় 'নিযুদ্ধ'-র মত প্রাণায়ামের মধ্য দিয়ে কুণ্ডলিনী জাগরণের তত্ত্বও চিনে নিয়ে যান। এই অনুমান আরও প্রবল হয় যখন লি হোংঝি লেখেন যে, তাঁর ফালুন-গঙ তত্ত্বের ভিত্তি হল ভগবান বুদ্ধের কর্মবাদ এবং অন্তিম লক্ষ্য হল বোধি (বা ব্রহ্মানন্দ) লাভ করা।

যাই হোক, এই তত্ত্ব চিনা নাগরিকদের মধ্যে দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করল। ১৯৯৪ সালে সমগ্র চিনে এর সদস্যসংখ্যা ছিল মাত্র ২০ লক্ষ, কিন্তু মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে, ১৯৯৯ সালে তা ১০ কোটি ছাড়িয়ে গেল। এই বিশাল সংখ্যক সদস্যরা প্রতিদিন পার্কে পার্কে জমা হয়ে শরীরচর্চা করতে লাগল। বিশেষজ্ঞদের ধারণা হল, আইন করে ধর্মাচরণ বন্ধ করে দেবার ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে জমা হয়েছিল দারুণ এক আধ্যাত্মিক ক্ষুধা এবং এই ক্ষুধা মেটাতেই দলে দলে মানুষ ফালুন-গঙের লাল-হলদ পতাকাতলে এসে জড়ো হয়েছে।

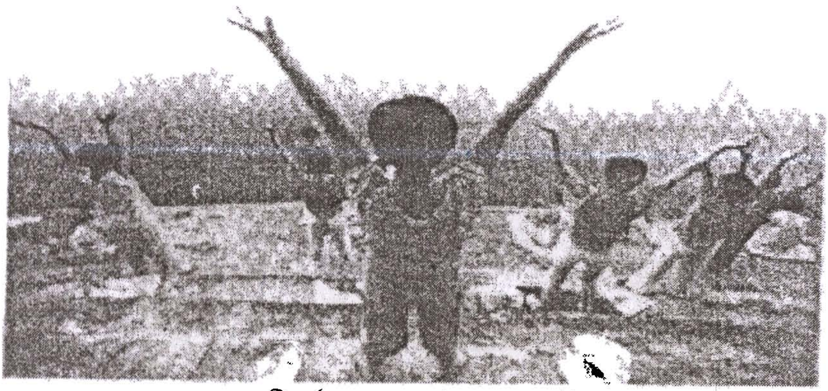


ফালুন গঙ শরীরচর্চার আবিষ্কর্তা লি হোং ঝি।

এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে বেজিং-এর এক শিক্ষাবিদ্ শ্রী শিন্ মিঙ বলেন, "চিনের বর্তমান আর্থিক অগ্রগতির পিছনে লুকিয়ে আছে নানাভাবে বিধ্বস্ত, বিষণ্ণ ও লক্ষ্যহীন এক চিনা সমাজ। বস্তুবাদী মার্কসবাদী তত্ত্ব চিনের কাছে সম্পূর্ণ বিদেশী এক অচেনা তত্ত্ব। এই তত্ত্ব জোর করে চাপিয়ে দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সেই প্রাচীন কাল থেকে চলে আসা চিনের সনাতন সংস্কৃতি, মূল্যবোধ এবং সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কার। হারিয়ে গিয়েছে চিনের মূল চরিত্র। এই কারণেই ফালুন-গঙের সত্য, শান্তি ও আধ্যাত্মিকতার আহ্বান চিনা জনগণকে আকৃষ্ট করছে। এর মধ্য দিয়ে তারা আত্মার মুক্তির পথ খুঁজে পাচ্ছে। খুঁজে পাচ্ছে সনাতন মূল্যবোধ।

কিন্তু ফালুন-গঙের এই অভাবনীয় উত্থান চিনা কমিউনিস্ট নেতাদের অসম্ভব ভীত করে তুলল। সর্বাপেক্ষা ভয়ের কারণ হল তাদের ১০ কোটি সদস্য সংখ্যা, যা চিনা কমিউনিস্ট পার্টির ৩ কোটি সদস্য সংখ্যার তিন গুণেরও বেশি। তারা ভাবল, এই ১০ কোটি সদস্য একত্র হয়ে তাদের ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে। রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল করে নিতে পরে। তাই নেতারা ও সরকারি খবরের কাগজগুলো প্রচার করতে শুরু করল যে, ফালুন-গঙ হল কমিউনিস্ট-বিরোধী এক চক্রান্ত

ইতিমধ্যে সরকার একটা তদন্ত কমিশন গঠন করল এবং এই তদন্ত কমিশনের লোকরা ফালুন-গঙের সদস্য হয়ে তার ভিতরে ঢুকে পড়ল এবং গোপনে তাদের কথাবার্তা টেপ করতে শুরু করল। সরকারের এই কাজের প্রতিবাদ জানাতে ১৯৯৯ সালের ২৫শে এপ্রিল প্রায় ২০,০০০ ফালুন-গঙ সদস্য বেজিং-এর সরকারি সদর দপ্তর ঝংনান্ হাই-এর সামনে বিশাল এক জনসমাবেশ করল। রাষ্ট্রপতি জিয়াং জেমিন একটা গাড়ি থেকে গোপনে সেই জনসমাবেশ প্রত্যক্ষ করলেন এবং বললেন, "ফালুন-গঙ সত্যিই এক ভয়ংকর আন্দোলন এবং সরকার এর থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারে না।"



শরীরচর্চায় রত ফালুনগত-এর সদস্যগণ

এর ফলশ্রুতি হিসাবেই জুলাই মাসের ২২ তারিখে ফালুন-গঙকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল। সরকারের তরফ থেকে কারণ দেখানো হল যে, ফালুন-গঙ আসলে এক ডাকিনী-বিদ্যা এবং বৃহত্তর সমাজের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। সরকার সেই সঙ্গে সঙ্গে সাবেক কী গঙকেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করল এবং শুরু হয়ে গেল ব্যাপক ধরপাকড় ও দমন-পীড়ন।





পুলিশ ফালুন গঙ সংক্রান্ত বইপত্র এবং ক্যাসেট জালিয়ে দিচ্ছে। (পাশে) নিগৃহীত ফালুন গঙ সদস্য।

প্রত্যেক শহরে ফলুন-গঙ কর্মকর্তাদের গ্রেপ্তার করা হল। তাদের বইপুস্তক বাজেয়াপ্ত করা হল। গুরু লি হোং ঝি-কে অপরাধী ঘোষণা করা হল এবং আমেরিকায় তাঁকে গ্রেপ্তার করার

জন্য ইন্টারপোল-এর সাহায্য চাওয়া হল। বেজিং-এর বাড়ি বাড়ি তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার করা হল ২০ লক্ষ বই ও টেপ করা ক্যাসেট। সেগুলোকে সব একত্র করে পুড়িয়ে ফেলা হল। বেজিং সহ সমস্ত শহরের ফালুন-গঙ সদস্যদের ধরে এনে খোলা আকাশের নীচে স্টেডিয়ামগুলোতে দিনের পর দিন আটক করে রাখা হল। ভবিষ্যতে কোনোদিন ফালুন-গঙ শরীরচর্চা করবে না বলে যারা মুচলেকা দিল, একমাত্র তারাই মুক্তি পেল। বাকিদের বেদম মারা হল এবং উত্তর চিনের জেলগুলোতে চালান করে দেওয়া হল। প্রায় ১২০০ প্রধান কর্মকর্তাকে বেদম প্রহার করার পর কোনো এক অজ্ঞাত স্থানে গুম করে দেওয়া হল। বেজিং ও অন্যান্য শহরগুলির রাস্তায় রাস্তায় সাধারণ মানুষকে পুলিশ খানাতল্লাশি করে হয়রান করতে থাকল। এ পর্যন্ত ১২০ জন সদস্যকে পুলিশ-হাজতে হত্যা করা হয়েছে, বেশ কয়েক হাজার কর্মকর্তা নিখোঁজ এবং বেশ কয়েক লক্ষ সদস্য জেল খাটছে বলে ফালুন-গঙের তরফ থেকে দাবি করা হয়।



ফালুন গঙ সদস্যের উপর পুলিশের অত্যাচার

এই সব ঘটনা এটাই প্রমাণ করছে যে, ব্যক্তি স্বাধীনতা বলে কোনো জিনিস কোনো কমিউনিস্ট দেশেই নেই। এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে বেজিং-এর শিক্ষাবিদ্ শিন্ মিঙ বলেন, "প্রকৃতপক্ষে এই সব দমন-পীড়ন হল এক আহাম্মকের নীতি। এর ফলে সরকারের কোটি কোটি শত্রু জন্মাচ্ছে। যারা আগে মিত্র ছিল, তারাও আজ শত্রুতে রূপান্তরিত হচ্ছে।"

কিন্তু এই বর্বর দমন-পীড়ন চালিয়েও সরকারের পক্ষে আজ পর্যন্ত এমন কোনো প্রমাণ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি যে, ফালুন-গঙ একটি রাজনৈতিক চক্রান্ত এবং এর অন্তিম লক্ষ্য হল কমিউনিস্ট সরকারকে উৎখাত করা। অথচ, তা সত্ত্বেও নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা বা শিথিল করা হচ্ছে না এবং দমন-পীড়ন বন্ধ করা হচ্ছে না। তবে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, বর্বর এই পশুশক্তির বিরুদ্ধে অন্তিমে মানবতারই একদিন বিজয় ঘোষিত হবে। যেমন হয়েছে রাশিয়া ও পূর্ব ইয়োরোপের অন্যান্য কমিউনিস্ট দেশগুলোতে।

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পক্ষেত্রে বিলগ্নিকরণ, বেসরকারিকরণ এবং মার্কসবাদীদের অপপ্রচার

কলকাতা থেকে সড়ক পথে রায়চক, তারপর লঞ্চে নদী পার হয়ে কুকড়াহাটি এবং সেখান থেকে আবার সড়ক পথে হলদিয়া—এটাই হলদিয়া যাওয়ার সবচেয়ে সোজা রাস্তা। হলদিয়া ঢোকার মুখে, ইন্ডিয়ান অয়েলের তৈল শোধনাগারের ঠিক আগে, এই রাস্তায় বাঁ দিকে, সকলেরই চোখে পড়বে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বিশাল একটি কারখানা। আজ একে কারখানা না বলে জঙ্গল বলাই ভাল। কারণ কারখানার ভিতরে জন্মেছে মানুষ সমান ঘাস, হোগলা ও নানারকমের বন্য গাছপালা। কারখানায় কোনো কাজ হয় না। বহু কোটি টাকা ও বিদেশী মুদ্রা ব্যয় করে বসানো বহুমূল্য যন্ত্রপাতি দিনের পর দিন, বছরের পর বছর রোদে জলে মরচে ধরে নষ্ট হচ্ছে। অপচয়ের এই ব্যাপকতা দেখলে চোখে জল আসে।

তবুও সকালবেলা কারখানার গেট দিয়ে বেরিয়ে আসে সারি সারি বাস। হলদিয়ার বিভিন্ন জায়গা থেকে তারা কর্মীদের তুলে আনে। কর্মীদের কারখানায় পৌঁছে দিয়ে বাসগুলো আবার বেরিয়ে পড়ে কর্মীদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। কর্মীরা সারাদিন তাস বা ক্যারাম খেলে কাটায়। বিকেল হলে বাসগুলো আবার বেরিয়ে পড়ে। প্রথমে কর্মীদের ছেলেমেয়েদের স্কুল থেকে বাড়ি পৌঁছে দেয়। তারপর কর্মীদেরও বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসে।

এই হল 'হিন্দুস্থান ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন লিমিটেড' বা 'এইচ এফ সি এল'-এর হলদিয়া ইউনিট এবং তার ১৪৫০ জন কর্মীর দৈনিক কর্মসূচী। এটা আজকের ব্যাপার নয়। ১৯৮৬ সাল থেকে শুরু করে বিগত ১৪ বছর ধরে প্রতিদিন এটা চলে আসছে। কর্মীদের মাসিক বেতন এবং তার সাথে কোম্পানির খরচে সস্তায় বসবাস, কোম্পানির স্কুলে সস্তায় ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা, সবই চলছে।

ইউরিয়া তৈরি করার জন্যই এই কারখানা গড়া হয়েছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত এক তোলা ইউরিয়াও এখানে তৈরি হয়নি। কাজেই বলা চলে যে, এই কারখানা থেকে আজ পর্যন্ত একটি পয়সাও আয় হয়নি। কিন্তু কর্মীদের বেতন ও অন্যান্য খাতে প্রতি বছর প্রায় ১৮ কোটি টাকা সরকার খরচ করে চলেছে। (১৯৯৮-'৯৯ আর্থিক বছরে মোট খরচ ১৭.৭৭ কোটি টাকা)। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার হল, খাতায় কলমে এই বার্ষিক খরচকে নির্মাণ-ব্যয় বলে দেখানো হচ্ছে। অথচ আজ থেকে ১৭ বছর আগে, ১৯৮৩ সালে এর নির্মাণ-কার্য সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

বিগত ১৯৭৮ সালে সাবেক 'ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া' বা 'এফ সি আই'কে ভেঙে 'এইচ এফ সি এল' গঠন করা হয়েছিল। তখন থেকে মোট ৪টি ইউনিট এর আওতায় আসে। এরা হল, আসামের নামরূপ, বিহারের বারাউনি এবং পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুর ও হলদিয়া ইউনিট। এই চারটি ইউনিটের মধ্যে বর্তমানে নামরূপ ইউনিটে সামান্য কিছু কাজ হচ্ছে এবং বাকি ৩টি ইউনিট সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে পড়ে আছে।

৭২৯ কোটি ১১ লক্ষ টাকার প্রস্তাব নিয়ে ১৯৭০ সালে হলদিয়া প্ল্যান্টের নির্মাণ কার্য শুরু হয়। কিন্তু নির্মাণ কার্যে অসম্ভব বিলম্বের জন্য শেষ পর্যন্ত মোট ব্যয় দাঁড়ায় ২৮৯৪ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা। সব তৈরি হয়ে যাওয়ার পরও পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে দেরি করে। ফলে পুরো ৩ বছর প্ল্যান্ট বসে থাকে। যাই হোক ১৮৮৬ সালে প্ল্যান্ট চালু করা হয় এবং অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই অক্সিজেন কম্প্রেসর যন্ত্রটি বিকল হয়ে যায়। সেই প্রথম এবং সেই শেষ। এরপর হলদিয়া প্ল্যান্টের চুল্লি আর জ্বলেনি।

'এইচ এফ সি এল'-এর সার্বিক ব্যর্থতার জন্য দুটো কারণ দায়ী বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। প্রথমত, ভৌগোলিক অবস্থান এবং দ্বিতীয়ত, ত্রুটিপূর্ণ কারিগরী বা টেকনোলজি। দেশে সবুজ বিপ্লব আনতে যে বাড়তি ইউরিয়ার প্রয়োজন হবে সেই চাহিদার কথা ভেবেই রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে রাসায়নিক সারের কারখানা স্থাপন করা হয়। বিশেষ করে পূর্ব ভারতের চাহিদা মেটানোর জন্য 'এইচ এফ সি এল' গঠন করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, পূর্ব ভারতে সবুজ বিপ্লব সার্থক হল না। কাজেই সারের চাহিদাও বাড়ল না। পক্ষান্তরে পশ্চিম ও উত্তর ভারতে সবুজ বিপ্লব সফল হল এবং সেখানে সারের চাহিদাও বৃদ্ধি পেল। তাই সেখানকার 'ন্যাশনাল ফার্টিলাইজার লিমিটেড' এবং 'রাষ্ট্রীয় কেমিকেল এন্ড ফার্টিলাইজার লিমিটেড' কাজ করতে থাকে।

কারিগরী ব্যাপারে বলতে হয় যে, 'এইচ এফ সি এল' ১৯৭৮ সালে গঠিত হলেও প্ল্যান্টগুলির মূল নক্শা তৈরি করার কাজ শুরু হয় ১৯৭০ সালে। তখন ইতালীর সংস্থা 'মন্তেকাতানি'-র মাধ্যমে ইতালীর কারিগরী ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, অথচ সেই সময় ইতালীয় কারিগরীর ব্যাপারে কোনো অভিজ্ঞতাই ভারতের ছিল না। এ ব্যাপারে আরও একটা কথা বলা যুক্তিযুক্ত হবে, তা হল পরে এই 'মন্তেকাতানি' কোম্পানি নাম বদল করে নতুন নাম 'স্নামপ্রোগেত্তি' গ্রহণ করে। এবং '৮০-র দশকে এই কোম্পানির ভারতীয় প্রতিনিধি অত্তাভিয়ো কাত্রোচ্চিকে নিয়ে নানারকম অবৈধ লেনদেনের অভিযোগ উঠতে থাকে। কিন্তু এইসব ব্যাপারে কোনোও পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। কারণ কত্রোচ্চি গান্ধী পরিবারের, বিশেষ করে রাজীব গান্ধী ও সোনিয়া গান্ধীর বিশেষ ঘনিষ্ঠ। পরে বোফর্স কামান কেনার ব্যাপারেও যে অবৈধ লেনদেন হয় তাতেও ওই কাত্রোচ্চির বিশেষ ভূমিকা ছিল বলে সি.বি.আই. রিপোর্ট দেয়। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, ইতালীয় কারিগরী ব্যবহার করে 'মন্তেকাতানি' তখন যতগুলি প্ল্যান্ট তৈরি করেছিল তার একটাও কাজ করেনি।

যাই হোক, ১৯৮৬ সালে হলদিয়ার প্ল্যান্ট চালু করার পর যখন অক্সিজেন কম্প্রেসরটি বিকল হল তখন কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে দেখা গেল যে, কম করে ১৫টি সংস্থা ওই অক্সিজেন কম্প্রেসরটির বিভিন্ন যন্ত্রাংশ সরবরাহ করেছিল। উপরন্তু ওইসব চুক্তিপত্র এতই নড়বড়ে ছিল যে 'স্নামপ্রোগেত্তি'-কে দায়ী করা বা তার কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করা সম্ভব হয় না।

বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার প্রায় ৫০০ কোটি টাকা খরচ করে নামরূপের ইউনিটটিকে পুনরুজ্জীবিত করার কাজ হাতে নিয়েছে। বাকি তিনটি ইউনিটকে পুনরুজ্জীবিত করতে খরচ হবে প্রায় ৭৮৫ কোটি টাকা। সরকারের পক্ষ থেকে এ প্রস্তাব বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।

কারণ ওই তিনটি প্ল্যান্টে ন্যাপথা থেকে ইউরিয়া তৈরি করতে যে খরচ পড়বে তার থেকে অনেক কম দামে বিদেশ থেকে ইউরিয়া আমদানি করা যাবে।

হলদিয়া, দুর্গাপুর ও বারাউনি এই তিনটি প্ল্যান্টের পিছনে সরকারের এ পর্যন্ত (১৯৯৮-৯৯) খরচ হয়েছে প্রায় ৪, ৯৫২.৩২ কোটি টাকা, যার মধ্যে রয়েছে ৪,২০৬.২০ কোটি টাকার বৈদেশিক ঋণ। কিন্তু এগুলোকে বিক্রি করে এর ভগ্নাংশও আজ পাওয়া সম্ভব নয়। তবুও এগুলোকে বেচে দিয়ে বেসরকারিকরণ দরকার, কারণ তা হলে বাৎসরিক ২৭৫ কোটি টাকার লোকসানের দায় থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে এবং ওই ২৭৫ কোটি টাকা অনেক কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা যাবে।

এই হল বর্তমান ভারতে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের একটি নমুনা, যার মধ্যে পড়ে ইস্পাত শিল্প, ভারী বৈদ্যুতিক শিল্প, ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, বিমা ক্ষেত্র, ব্যাঙ্ক ক্ষেত্র, বিমান পরিবহন ক্ষেত্র, রেল পরিবহন ক্ষেত্র ইত্যাদি। সব ক্ষেত্রেই লোকসান। উদাহরণ স্বরূপ ইস্পাত শিল্পের কথা বলা যেতে পারে। কারণ রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের এটা এক অন্যতম বৃহৎ শিল্প। বিগত ১৯৯৭-'৯৮ আর্থিক বছরের প্রথম ৬ মাসে 'স্টিল অথরিটি অব ইন্ডিয়া' বা SAIL-এর মোট লোকসানের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬১৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ দৈনিক লোকসানের পরিমাণ ৩ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা।

১৯৫০-এর দশকে সোভিয়েত রাশিয়াকে নকল করার মধ্য দিয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ভারতে 'পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা' ও 'রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে'র প্রবর্তন করেন। তিনি তখন ঘোষণা করেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের এইসব কলকারখানাগুলো হল আধুনিক ভারতের মন্দির। তিনি তখন ভাবতে পারেননি যে কালে এগুলো অপদেবতার মন্দিরে পরিণত হবে। আজ দেশে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে ২৪০টি বড় সংস্থা রয়েছে যাতে ২,৩০,০০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ পচে নষ্ট হচ্ছে বা লোকসানের দায়ে ধুঁকছে। বর্তমান প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকার তাদের নিজস্ব কোনোও ক্ষমতা নেই। প্রতি বছর ভরতুকি দিয়ে লোকসানে জর্জরিত এইসব সংস্থাকে টিকিয়ে রাখার অর্থ দেশের সম্পদ জলে ভাসিয়ে দেওয়া।

কিন্তু মজার কথা হল, যখনই কেন্দ্রীয় সরকার কোনোও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে বিলগ্নিকরণ বা বেসরকারিকরণের কথা বলে, তখনই আমাদের মার্কসবাদী নেতারা 'গেল গেল' রব তুলে এক ব্যাপক গোলযোগ শুরু করে দেন। দেশকে বিদেশের কাছে বেচে দেওয়া হচ্ছে বলে চেঁচাতে শুরু করেন। বিশেষ করে মার্কসবাদী শ্রমিক সংগঠনের নেতারা নানারকম সত্যমিথ্যা বলে শ্রমিকদের খেপিয়ে তোলেন এবং বনধ্, ধর্মঘট ইত্যাদির মাধ্যমে এক ব্যাপক অরাজকতা শুরু করেন। যে কথা বলে তাঁরা শ্রমিকদের সবথেকে বেশি খেপিয়ে তোলেন তা হল, বেসরকারিকরণ হলে ব্যাপক ছাঁটাই হবে, অনেক লোক বেকার হবে।

মার্কসবাদী তত্ত্ব অনুসারে ব্যক্তিগত মালিকানায় কলকারখানা থাকা ভীষণ খারাপ এবং সব রকম অনিষ্টের মূল। ওই সব কারখানার মালিকরা বা বুর্জোয়ারা শ্রমিকদের শোষণ করে নিজেদের পেট মোটা করে এবং শ্রমিকরা দুর্দশাগ্রস্ত হতে থাকে। মার্কসবাদী মতে কাঁচা মালের সঙ্গে শ্রমিকদের শ্রম যোগ হওয়ার ফলেই উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে মূল্যের সৃষ্টি হয়। কাজেই সেই

উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রি করে যা লাভ হয় তার সবটাই শ্রমিকদের প্রাপ্য। কিন্তু বুর্জোয়ারা কোনো পরিশ্রম না করেই সেই লাভের অংশ অন্যায় ভাবে আত্মসাৎ করে।

তাই মার্কসবাদী সমাজতন্ত্রের মূল কথাই হল, ব্যক্তিগত মালিকানায় কোনো কারখানা থাকবে না। সমস্ত কলকারখানার মালিক হবে রাষ্ট্র। এইভাবে বুর্জোয়া শ্রেণির অবলুপ্তি ঘটবে এবং সমাজ শোষণমুক্ত হবে। কিন্তু তাত্ত্বিক দিক দিয়ে তবুও কিছুটা অসুবিধা দেখা দিল। ব্যক্তিগত মালিকানার পুঁজিবাদী সমাজে মানুষ কাজ করে টাকার জন্য। বেশি কাজ করলে বেশি টাকা। তাই টাকার লোভেই তার কাজ করার স্পৃহা জাগ্রত হয়। কাজেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে শ্রমিকদের কাজ করবার স্পৃহা জাগবে কেমন করে? কারণ মার্কসবাদী সমাজতন্ত্রে বলা আছে যে, সকলেরই তার সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পারিশ্রমিক নেবে।

এ ব্যাপারে মার্কস বললেন যে, তখন মানুষে মানুষে এক অ-শত্রুতামূলক প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হবে এবং শ্রমিকরা নিজের কাজকে সমাজের কাজ মনে করে বেশি বেশি খাটতে শুরু করে দেবে। তদের মধ্যে বেশি কাজ করার এক প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যাবে। অর্থাৎ বিগত কোটি কোটি বছর ধরে মানুষের মধ্যে যে হিংসা, লোভ পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি বদগুণ বাসা বেঁধেছে, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে চোখের নিমেষে তা দূর হয়ে যাবে। সব মানুষ মহৎ হয়ে যাবে এবং সমাজের জন্য দিনরাত খাটতে শুরু করে দেবে। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, এই অলীক তত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বলে মার্কসবাদীরা প্রচার করে চলেছে এবং চেঁচিয়ে পৃথিবী মাত করছে।

কিন্তু চেঁচিয়ে অল্প কিছু লোককে কিছুদিনের জন্য বোকা বানানো যায়, মিথ্যাকে সত্য বানানো যায় না। রাশিয়ায় এই মহান সমাজতান্ত্রিক তত্ত্ব ব্যর্থ প্রমাণিত হল। রাষ্ট্রায়ত্ত কলকারখানায় মুড়ি-মিছরির এক দর হওয়ার ফলে শ্রমিকদের কাজ করার স্পৃহা অচিরেই উধাও হয়ে গেল। ফলে দেখা দিল উৎপাদনের ভয়ঙ্কর অপ্রতুলতা। কৃষি-খামারগুলোতে উৎপাদন এত কমে গেল যে একটুকরো রুটির জন্য হাহাকার পড়ে গেল। মার্কসের কোনো তত্ত্বই পরিস্থিতি সামাল দিতে পারল না। ফলে মস্কোর ক্রেমলিনের চূড়া থেকে কাস্তে-হাতুড়ি লাঞ্ছিত লাল পতাকা নেমে এল এবং সেখানে গণতন্ত্রী রাশিয়ার ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা উড্ডীন হল।

আর এক মহান সমাজতন্ত্রী দেশ হল চিন। রাষ্ট্রায়ত্তকরণের বিপদ বুঝতে পেরে চিনা কর্ণধার দেঙ জিয়াও পিং ৮০-র দশকে চিনে বেসরকারিকরণের বন্যা বইয়ে দিলেন এবং বিদেশী পুঁজির জন্য চিনের দরজা খুলে দিলেন। তা সত্ত্বেও চিনে প্রায় ৩ লক্ষ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা তখনও টিকে গেল।

বিগত ১৯৯৭ সালে চিনা কমিউনিস্ট পার্টির ১৬শ কংগ্রেসে চিনের বর্তমান রাষ্ট্রপতি জিয়াং জেমিন একটি প্রস্তাব পেশ করলেন, যা 'জিয়াং প্ল্যান' নামে খ্যাত। এই প্রস্তাবে বলা হল যে, ৩ লক্ষ সরকারি সংস্থার মধ্যে সামরিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাত্র ১০০০ সংস্থা বাদে বাকি ২ লক্ষ ৯৯ হাজার সংস্থার বেসরকারিকরণ করা হবে। ফলে ২ থেকে ৩ কোটি লোক বেকার হবে।

রাষ্ট্রপতি জিয়াং-এর প্রতিদ্বন্দ্বী কিয়াও শী ওই প্রস্তাবের বিরোধিতা করায় তাঁকে পার্টি কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করা হল। ফলে 'জিয়াং প্ল্যান' বিনা বাধায় গৃহীত হল। বর্তমানে এই 'জিয়াং প্ল্যান' চিনে চালু আছে। ফলে বহু শ্রমিক বেকার হচ্ছে। এই কর্মসূচী রূপায়িত করতে আরও প্রায় ৩

বছর লাগবে এবং তখন মোট ৩ কোটি লোক বেকার হবে। আমাদের যে সব মার্কসবাদীর দল বেসরকারিকরণের ফলে শ্রমিক ছাঁটাই হবে বলে দিনরাত চোখের জল ফেলছেন, চিনের এই ব্যাপক বেসরকারিকরণ ও শ্রমিক ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে তাঁরা আজ পর্যন্ত টু শব্দটি করেছেন বলে শোনা যায়নি। উপরন্তু তাঁরাই আবার গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলকে একটা ফরাসি কোম্পানির কাছে বেচে দেওয়ার মতলব কষছেন। শুধু তাই নয়। সম্প্রতি তাঁরা পশ্চিমবঙ্গের ৭৮টি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-সংস্থাকে বেসরকারিকরণ করার এক পরিকল্পনা তৈরি করেছেন।

যাই হোক, উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটাই স্পষ্ট হচ্ছে যে, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের ধারণা মার্কসের অলীক কল্পনার একটি ফসল মাত্র এবং বাস্তবে তা রূপায়িত করা কখনই সম্ভব নয়। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প হল একটি সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ধারণা এবং ক্রমাগত সরকারি টাকা খরচ করে এগুলোকে টিকিয়ে রাখার অর্থ হল ধ্বংসের পথে অগ্রসর হওয়া। তাই দেশকে যাঁরা ভালবাসেন, যাঁরা দেশের দীর্ঘস্থায়ী কল্যাণ কামনা করেন, তাঁরা অবশ্যই এগুলোকে বেসরকারিকরণের কথা বলবেন।

কিন্তু মার্কসবাদীদের অসুবিধা হল তারা দেশ বোঝে না। তাদের কাছে দেশ দু'রকমের— যে দেশ কমিউনিস্টরা শাসন করছে আর যে দেশ কমিউনিস্টরা শাসন করছে না। যে সব দেশে কমিউনিস্টদের শাসন চলছে সেখানে সবই ভাল। সেখানেই তাদের চিত্ত পড়ে আছে। মাতৃভূমি ভারতে তাদের চিত্ত নেই।

আর একটা জিনিস মার্কসবাদীরা বোঝে, তা হল ক্ষমতা। তারা বোঝে ক্ষমতা দখল করা এবং ক্ষমতায় টিকে থাকা। দেশের দীর্ঘস্থায়ী মঙ্গলের বদলে তারা বোঝে ৫ বছরের রাজনীতি। গত ভোটে জিতে পাঁচ বছরের জন্য ক্ষমতায় বসেছি। সামনের ভোটে জিতে আবার কি করে পাঁচ বছরের ক্ষমতায় আসব। তাই তাদের নীতি হল, ঘোলা জলে মাছ ধরা। দেশের মানুষকে ভূরি ভূরি মিথ্যা কথা বলে ভোট কুড়নো।

সৌজন্যে : বর্তমান ১২/১২/২০০১

উত্তর কোরিয়ায় সমাজতন্ত্র ঃ এক জার্মান ডাক্তারের অভিজ্ঞতা

উত্তর কোরিয়ায় ডাক্তারের খুবই অভাব। ফলে সেখানকার রোগীদের ঠিকমত চিকিৎসা হয় না। এক কালে কমিউনিস্ট পূর্বজার্মানী থেকে চিকিৎসকের দল পাঠানো হত এবং তারা সেখানকার স্থানীয় ডাক্তারদের নানাভাবে সাহায্য করত। বর্তমানে পূর্বজার্মানীর পৃথক অস্তিত্ব লুপ্ত হয়েছে। দুই জার্মানী এক হয়ে গিয়েছে। তবুও মানবিক আবেদনে সাড়া দিয়ে সেখানকার ডাক্তারদের অনেক স্বয়ংসেবী সংস্থা উত্তর কোরিয়ায় গিয়ে রোগীদের চিকিৎসা করে এবং ওষুধপত্র ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম দিয়ে সাহায্য করে থাকে। 'জার্মান ইমার্জেন্সী ডক্টর' এরকমই একটি স্বয়ংসেবী সংস্থা, যার সদস্য হিসাবে ডাক্তার নরবার্ট ভলারৎসেন (Norbert Vollertsen) ১৯৯৯ সালের জুলাই মাসে উত্তর কোরিয়ায় যান। তারপর তিনি প্রায় দেড় বছর সেখানে কাটান এবং উত্তর কোরিয়ার বিভিন্ন হাসপাতালে রোগীদের পরিচর্যা করেন।

ডাঃ ভলারৎসেন খুব নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর দায়িত্ব পালন করেন এবং তাঁর কাজের স্বীকৃতি হিসাবে উত্তর কোরিয়ার সরকার তাঁকে একটি পদক দিয়ে সম্মানিত করে। সেখানকার খবরের কাগজগুলোতেও তাঁর কাজের প্রশংসা করে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। ফলে ওই মেডেল ও খবরের কাগজের কাটিং দেখিয়ে ডাঃ ভলারৎসেনের পক্ষে এমন অনেক জায়গায় যাওয়া সম্ভব হয় যেখানে সাধারণত বিদেশীদের যাবার অনুমতি নেই। তাই তাঁর পক্ষে উত্তর কোরিয়ার হালচাল এবং সেখানকার কমিউনিস্ট সরকারের কার্যকলাপ আরও গভীরভাবে জানা সম্ভব হয়। সব থেকে বড় কথা হল, ডাক্তার ভলারৎসেন তাঁর এই সব অভিজ্ঞতার কথা ডায়েরির পাতায় লিপিবদ্ধ করে রাখেন। সম্প্রতি সেই ডায়েরির ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

পায়ং য়ং-এর মাটিতে পা দিয়েই ভলারৎসেন লক্ষ্য করলেন যে সেখানকার সব লোকজনের বুকেই লাগানো রয়েছে বিচিত্র এক ধরনের পিন। ভিন্ন ভিন্ন রং ও ভিন্ন ভিন্ন ডিজাইনে তৈরি সেই সব পিন। পরে তিনি জানতে পারলেন যে, ওই সব পিন সরকার থেকে দেওয়া হয়। পিনের রং ও ডিজাইন দেখে মুহূর্তের মধ্যে বলে দেওয়া সম্ভব যে, সমাজের কোন্ স্তরে সেই ব্যক্তির অবস্থান। ব্যাপারটা ডাঃ ভলারৎসেনকে খুবই অবাক করল। যে কমিউনিস্ট তত্ত্ব মানুষে মানুষে বিভেদ ঘুচিয়ে সাম্য প্রতিষ্ঠার কথা বলে সেই কমিউনিস্ট সরকারই মানুষে মানুষে এরকম বিভেদের প্রাচীর খাড়া করতে পারে? ভাবতে খুবই কষ্ট পেলেন ডাক্তার ভলারৎসেন। মার্কসবাদীরা বলে যে, তাদের সমাজতন্ত্রে ধনী গরিব সকলেই সমান মর্যাদা, সমান সুযোগ-সুবিধা পাবে। এক কথায় মানুষে মানুষে সব বিভেদ ঘুচে যাবে। তাদের এই প্রচার যে কতখানি মিথ্যা তা নিজের চোখে দেখে অবাক হয়ে যান ডাঃ ভলারৎসেন। মানুষে মানুষে যে এরকম পাহাড়প্রমাণ বিভেদ ও অসাম্য কোথাও থাকতে পারে উত্তর কোরিয়ায় না এলে তাঁর পক্ষে বিশ্বাস করাই মুশকিল হত। সমাজের উচ্চস্তরের কর্তারা পায়ং য়ং-এর ৬-লেনের রাস্তায় মার্সিডিজ চড়ে বেড়াচ্ছেন। আর তার পাশের কোন গ্রামেই হয়তো শিশুরা ক্ষুধায় মারা যাচ্ছে অথবা নিদারুণ অপুষ্টিতে ভুগছে।

যাই হোক, এই সব অত্যন্ত অমানবিক ব্যাপার স্যাপার দেখে ডাঃ ভলারৎসেন তাঁর ডায়েরির পাতায় লিখলেন, ''যেন এক আজব দেশের আজব লোকজনের মধ্যে এসে পড়লাম। এদের প্রায় সকলেই মানসিক রোগাক্রান্ত। খুব সম্ভবত প্রচণ্ড এক ভীতি থেকেই এই সব মানবিক রোগ জন্ম নিয়েছে। আবশ্যিক ড্রিল, প্যারেড করে করে এরা জীর্ণ-শীর্ণ। ভোর ৬টা থেকে কনকনে ঠান্ডার



অনাহারে অপুষ্টিতে দুপায়ে দাঁড়াতে অক্ষম উত্তর কোরিয়ার শিশু

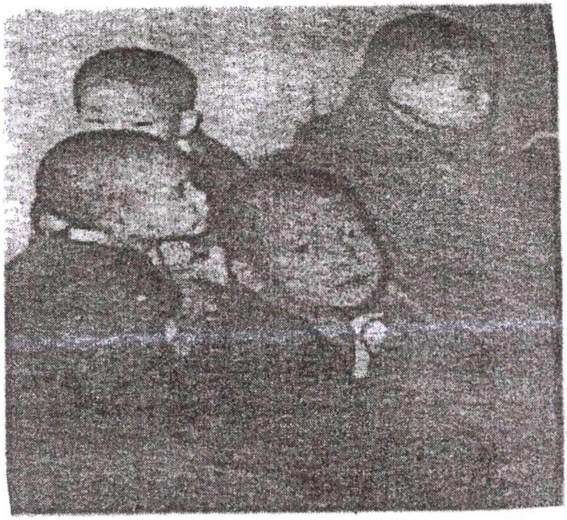
মধ্যে এই সব ড্রিল প্যারেড শুরু হয়। এখানকার আরেকটা বৈশিষ্ট্য হল, হাসপাতালগুলো সব সময়ই রোগীতে ঠাসা। রোগীরা বেশিরভাগই হল অভুক্ত শিশুর দল। অনাহারে অনেকে এত দুর্বল হয়ে পড়েছে যে, দুপায়ে দাঁড়াতে অক্ষম। এদের বাবা-মা'র বুকের পিন ইঙ্গিত দেয় যে, তারা সমাজের সর্বাপেক্ষা নিম্ন শ্রেণির লোক। প্রায় ক্রীতদাসের সমতুল্য।"

বিগত প্রায় ১ দশক ধরে চলতে থাকা দুর্ভিক্ষের ফলে উত্তর কোরিয়ার বেশিরভাগ মানুষই আজ অপুষ্টির শিকার। চিকিৎসা ব্যবস্থার হালও অত্যন্ত খারাপ। ওষুধপত্র ও সামান্য সাজসরঞ্জাম কেনার পয়সাও হাসপাতালগুলোর নেই। আগেকার দিনে এখানকার ছাত্ররা কমিউনিস্ট পূর্ব-জার্মানীতে গিয়ে ডাক্তারিবিদ্যা শিখে আসতো। আজ এখানে যারা ডাক্তারি করছে তারা সবাই পূর্ব-জার্মানীতে শিক্ষিত। মজার কথা হল, তখন যা শিখে এসেছে সেটাই তাদের সম্বল। চিকিৎসাশাস্ত্রে অধুনা যে সব উন্নতি হয়েছে তার কোনো খোঁজ-খবরই এরা রাখে না। ডাঃ ভলারৎসেন লিখছেন, "আমার ১৮ মাস অবস্থান কালে সেখানে কোনো বড় অস্ত্রোপচার হতে দেখিনি। হার্ট অপারেশনের মত কোনো জটিল অপারেশনের তো প্রশ্নই ওঠে না, সামান্য, গলব্লাডার অপারেশন করার যন্ত্রপাতিও সেখানে নেই। অজ্ঞান করার যন্ত্রপাতি সব বিকল হয়ে পড়ে আছে। তাই অজ্ঞান না করেই অপারেশন করা হয়।"

ডাঃ ভলারৎসেন কয়েক মাস পায়ং য়ং-এর একটা হাসপাতালে ছিলেন। একদিন সেখানে এক রোগীকে নিয়ে আসা হল। গাড়ী চাপা পড়ে লোকটার একটা পায়ের হাড় ভেঙে গিয়েছে। কোনো প্রাথমিক চিকিৎসা না করার ফলে ক্ষতস্থান বিষাক্ত হয়ে পচন শুরু হয়ে গিয়েছে। পা-টা তক্ষুণি কেটে বাদ দেওয়া দরকার। কিন্তু অজ্ঞান না করে পা কাটা হবে কেমন করে? ডাঃ ভলারৎসেন লিখছেন, "একজন ডাক্তার কোথা থেকে তাড়ির মত একটা জিনিস খানিকটা নিয়ে এল এবং লোকটাকে বেশ খানিকটা খাইয়ে দিল। নেশার ফলে লোকটা একটু আচ্ছন্নের মত হয়ে পড়ল, আর সেই ফাঁকে ডাক্তার তা পা কেটে বাদ দিল।"

১৯৯৯ সালের জুলাই মাসে ডাঃ ভলারৎসেন পায়ং য়ং-এর উপকণ্ঠে হেজু হাসপাতালে যান এবং সেখানকার দুরবস্থা সম্পর্কে ডায়েরিতে লেখেন, "সব ঘরগুলোই রোগীতে ভর্তি। ঘরের

কোণায় কোণায় জমে আছে নোংরা। সমস্ত হাসপাতাল জুড়ে রয়েছে এক পচা দুর্গন্ধ। সহ্য করা যায় না। বমি আসে সেই দুর্গন্ধে। মৃতপ্রায় দুর্বল রোগীরা শুয়ে আছে। রক্ত ও পুঁজ মাখা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। মাছি ও মশার অবাধ রাজত্ব। রোগীদের জন্য মশারির ব্যবস্থা নেই। না আছে পরিষ্কার বিছানার চাদর, না আছে হাত ধোবার সাবান।"



অপুষ্টিজনিত রোগে আক্রান্ত গ্রামের শিশু।

ঐ বছরই ডিসেম্বর মাসের ৫ তারিখে হাসপাতালে এলো ৮ বছরের একটি মেয়ে। তার ফিমোরাল হাড় ভেঙে গেছে। জরুরী অপারেশন দরকার। অজ্ঞান না করেই অপারেশন করতে হবে। অপারেশনের টেবিলটাকে নিয়ে যাওয়া হল খোলা জানালার কাছে। কারণ হাসপাতালে বিদ্যুতের ব্যবস্থা নেই, তাই রোদের আলোতেই অপারেশন সারতে হবে। অবশ করার সামান্য



অপুষ্টি জনিত রোগে আক্রান্ত হাসপাতালের শিশু রোগী

একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে অপারেশন শুরু হল। প্রায় ৪৫ মিনিট পরে ইঞ্জেকশনের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেল। অসহ্য যন্ত্রণায় মেয়েটি কাৎরাতে লাগল। তার মধ্যেই অপারেশেন চলতে লাগল।

ডাঃ ভলারৎসেন একবার পায়ং য়ং-এর কাছে পিন-ওয়ান হাসপাতালে কাজ করেত যান। সেই সময় অল্পবয়স্ক একটি মেয়েকে সেখানে আনা হল। মেয়েটি অ্যাপেন্ডিসাইটিসের ব্যথায় কাৎরাচ্ছিল। তক্ষুণিই অপারশেন করা দরকার, না হলে বাঁচানো যাবে না। তাকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হল। অপারেশন টেবিলটাকে যথারীতি জানালার কাছ নিয়ে যাওয়া হল। তারপর ডাঃ ভলারৎসেন লিখছেন, "অজ্ঞান করার যন্ত্রপাতি খারাপ হয়ে পড়ে আছে। যা হোক, তাই দিয়ে অজ্ঞান করার চেষ্টা করা হল। ডাক্তাররা পেট কেটে ফালা করে ফেলেছে, এমন সময় মেয়েটির জ্ঞান ফিরে এলো। যন্ত্রণায় মেয়েটি কুঁকড়ে যেতে থাকল, কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার সে মুখ দিয়ে কোনো শব্দ করল না।....... হাসপাতালে না ছিল কোনো ওষুধপত্র, না কোনো অ্যান্টিসেপটিক বা ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ। ডাক্তাররা গ্লাভস্ না পরেই অপারেশন সারলেন। কিন্তু কাজ শেষ হলে দেখা গেল, হাত ধোবার একখানা সাবান পর্যন্ত নেই।....... অপারেশন থিয়েটারের মেঝেতে কোথাও জমে আছে রক্ত, কোথাও বা নোংরা। যেন এক নরককুণ্ড।"

ডাক্তার ভলারৎসেন একদিন পায়ং য়ং-এর কাছেই বন্দর নগর নামপো যাচ্ছেন। যেতে যেতে দেখতে পেলেন বাচ্চা বাচ্চা ছেলেদের দল রাস্তার মাঝখানে কাজ করছে। একজন দুজন নয়, হাজার হাজার। তার মধ্যে আট বছরের শিশুও রয়েছে। খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারলেন যে, আগামী ২০০০ সালের অক্টোবর মাসে ক্ষমতাসীন ওয়ার্কার্স পার্টির শাসনের ৪৪ বছর পূর্তি হবে এবং তারই প্রস্তুতি হিসাবে বাচ্চাদের বেগার খাটিয়ে রাস্তাঘাট সুন্দর করা হচ্ছে। এছাড়া চলছে নানা অনুষ্ঠানের মহড়া। আমেরিকার বিদেশ মন্ত্রী শ্রীমতী ম্যাডেলিন অলব্রাইটের আসন্ন উত্তর কোরিয়া সফরের জন্যও চলছিল জোর মহড়া। অভুক্ত দুর্বল শিশুদের দিয়ে পায়ং য়ং-এর পার্কে পার্কে তখন মহড়া চলছিল শ্রীমতী অলব্রাইটকে স্বাগত জানাবার জন্য।

যাই হোক, গত বছর (২০০০ খ্রিঃ) নভেম্বর মাসে ডাক্তার ভলারৎসেন এবং অন্য একজন জার্মান নার্সকে পায়ং য়ং থেকে ৫০ কি.মি. দূরে পুকচাং নামক স্থানে পাঠান হল সেখানকার হাসপাতালে কাজ করার জন্য। হাইওয়ে দিয়ে গাড়ি করে যাবার সময় ডাঃ ভলারৎসেন দেখতে পেলেন যে, রাস্তায় প্রায় মাঝখানে পড়ে আছে একটি মৃতদেহ। তিনি কোরিয় ড্রাইভার ছেলেটিকে গাড়ি থামাতে বললেন। কিন্তু সে অত্যন্ত ভয়ের সঙ্গে বলল যে, এখানে গাড়ি থামানো উচিত হবে না। তিনি তখন তাকে বললেন যে, গাড়ি না থামালে তিনি চলন্ত গাড়ি থেকেই ঝাঁপ দেবেন। এতে কাজ হল, ছেলেটি গাড়ি থামালো।

মৃত দেহটার কাছে গিয়ে ডাঃ ভলারৎসেন বুঝতে পারলেন যে, সেটা একটা যুবক সৈনিকের মৃতদেহ। জামাটা একটু সরিয়ে দেখতে পেলেন ঘাড়ে ও পিঠে গভীর ক্ষতচিহ্ন। সঙ্গের নার্সটি ছিল সাবেক পূর্ব-জার্মানীর মেয়ে। তাই কমিউনিস্ট দেশের রীতিনীতি, হালচাল সম্বন্ধে তার পরিচয় ছিল। সে এক নজর দেখেই বলে উঠল, "একে অত্যাচার করে হত্যা করা হয়েছে", কমিউনিস্ট দেশের এটাই রীতি। সরকারি কাজকর্মের সমান্যতম সমালোচনা করলে বা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলে এ-ই তার ভয়ঙ্কর পরিণতি।

কিন্তু ডাঃ ভলারৎসেনের পক্ষে এই অন্যায় অত্যাচার নীরবে সহ্য করা সম্ভব হল না। কেন ছেলেটিকে মারা হয়েছে তার কারণ জানতে চেয়ে তিনি সরকারের কাছে আবেদন জানালেন। এত ঔদ্ধত্য কোন কমিউনিস্ট সরকারের পক্ষেই সহ্য করা সম্ভব নয়। তাই ডিসেম্বর মাসে ৩০ তারিখে ডাঃ ভলারৎসেন উত্তর কোরিয়া থেকে বিতাড়িত হলেন।

তিয়েনানমেন-এর ছাত্র-সংহার ও আজকের চিন

আজ থেকে ২১ বছর আগে, ১৯৮৯ সালের ৪ জুন, বেজিং শহরের তিয়েনানমেন স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এক নারকীয় বর্বরতা, যা সমস্ত সভ্য জগৎকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। সেই পাশব বর্বরতা তৈমুর লঙ বা নাদির শাহের পৈশাচিক নর সংহারের ঘটনাকেও ম্লান করে দিয়েছিল। চিনের ছাত্ররা বাক্‌স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবি নিয়ে তিয়েনানমেন স্কোয়ারে অবস্থান ধর্মঘট করেছিল। চিনা কমিউনিস্ট পার্টির সর্বোচ্চ কর্তা দেঙ জিয়াও পিঙের নির্দেশে ঐ দিন চিনা কমিউনিস্ট সরকারের লাল ফৌজ সেই অবস্থানরত ছাত্রদের ওপর মেশিনগান দিয়ে নির্বিচারে গুলি চালায়। বহু ছাত্র গুলির আঘাতে মারা যায়। বহু ছাত্রকে লালফৌজের ট্যাঙ্ক মাটিতে পিষে দেয়। কত হাজার ছাত্র সেদিন মারা পড়েছিল তা আজও জানা সম্ভব হয়নি। কারণ খুনি কমিউনিস্ট সরকার আজ পর্যন্ত নিহত ছাত্রদের কোনো তালিকা প্রকাশ করেনি। এই ঘটনা কমিউনিস্ট বর্বরতার সমস্ত অতীত দৃষ্টান্তকে যে অতিক্রম করে গিয়েছিল তা বলাই বাহুল্য।

শ্রীমতী ডিঙ চিলিঙ বেজিং বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের একজন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা। সেই ভয়ঙ্কর দিনে তাঁর ১৭ বছরের ছেলে গুলিতে মারা যায়। সেই বিভীষিকাময় দিনের কথা অনেকেই আজ ভুলে গিয়েছে। কিন্তু ডিঙ চিলিঙ দম্পতির মত পুত্রহারা মা বাবার পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। পুত্রহারা এ রকম ১০৫টি দম্পতি কিছুদিন আগে এক কাণ্ড ঘটিয়ে বসে যা কমিউনিস্ট চিনের ইতিহাসে নজিরবিহীন। শ্রীমতী ডিঙের নেতৃত্বে তারা বিচারালয়ের দ্বারস্থ হন এবং ওই ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্ত দাবি করেন। কিছু দিন আগে থেকে শ্রীমতী ডিঙ ও তাঁর স্বামী তাঁদের মত পুত্রহারা বাবা-মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা শুরু করেন। কিন্তু বেশির ভাগ বাবা মা-ই দানবরূপী কমিউনিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে কোনো রকম পদক্ষেপ নিতে ভয় পায়।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ১০৫ জন নিহত ছাত্রের বাবা-মায়েরা সাহস করে এগিয়ে আসেন এবং একটি যুক্ত-আবেদন (Joint petition) আদালতে দাখিল করেন। এই আবেদনে তাঁরা (১) ঘটনার বিচার-বিভাগীয় তদন্ত, (২) সমস্ত নিহত ছাত্রের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ এবং (৩) পুত্রহারা সকল পরিবারের জন্য ন্যায্য ক্ষতিপূরণ দাবি করেন।

কিন্তু তাদের এই ন্যায়সঙ্গত দাবি অত্যাচারী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দকে ক্রুদ্ধ করে তুলল। তাদের মতে, বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি করে শ্রীমতী ডিঙ ও তাঁর সঙ্গিসাথীরা কমিউনিস্ট সরকারের সমস্ত নিয়ম নীতি ও বিধি-শৃঙ্খলাকে অতিক্রম করেছেন। ফলে তাঁরা সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক ব্যক্তি বলে ঘোষিত হলেন এবং শ্রীমতী ডিঙ ও তাঁর স্বামী গৃহবন্দী হলেন। বেজিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের মধ্যে সরকারি আবাসনে তাঁরা বাস করতেন। সরকার থেকে আদেশ জারি করা হল যে, ডিঙ দম্পতির পক্ষে ক্যাম্পাসের বাইরে যাওয়া নিষেধ। হাট-বাজার, কেনাকাটা, সবই তাঁদের করতে হবে ক্যাম্পাসের দোকান বাজার থেকে। তাঁদের ওপর নজর রাখার জন্য মোতায়েন করা হল (সাদা পোশাক) লালফৌজের লোক। বিদেশী সাংবাদিকরা তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে গেলে শ্রীমতী ডিঙ তাঁদের জানালেন, ''কি করে ভাল থাকতে পারি বলুন। সরকার তার চিরাচরিত কায়দায় আমাদের উপর মানসিক নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। অল্প বয়সের দশ বারোটি ছোকরা সব সময় আমাদের ফ্ল্যাটের চারপাশে ঘুরঘুর করছে। তারা আমাদের শুনিয়ে শুনিয়ে

বলছে, "বাইরে বেরোবার চেষ্টা করলে পরিণতি খুবই খারাপ হবে। চিরকালের মত গুম করে ফেলব।" একে মানসিক অত্যাচার ছাড়া আর কি বলা যায় বলুন?"

শ্রীমতী ডিঙ সাংবাদিকদের আরও বলেন, "সেই রক্তাক্ত ঘটনার পর আজ এক দশক পার হয়ে গেল, কিন্তু নেতাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র অনুতাপের লক্ষণ নেই। তারা এখনও প্রচার করে চলেছে যে, ওটা মোটেই ছাত্র আন্দোলন ছিল না। ওটা ছিল প্রতি-বিপ্লবীদের এক গভীর ষড়যন্ত্র এক প্রকাণ্ড বিদ্রোহ। তাই এই ব্যাপারে চিনা সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী বদল হবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।" তারা আরও প্রচার করছে যে, সেই প্রতি-বিপ্লবী চক্রান্তকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করতে সরকার সে



তিয়েনানমেন স্কোয়ারে অবস্থানরত চীনা ছাত্র।

দিন সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপই নিয়েছিল। কঠোর হাতে তা দমন না করলে ভবিষ্যতে এক ভয়ঙ্কর বিপদ ঘটতে পারতো।

চিনা সরকারের এই প্রচার অভিযান অনেকাংশেই সফল হয়েছে বলা চলে। চিনের বেশির ভাগ মানুষই এই প্রচারে আজ বিভ্রান্ত। এই প্রচারে তারা এতটাই প্রভাবিত যে, অনেকেই সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ডকে পরোক্ষভাবে সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, আজ থেকে এক দশক আগে চিনের জনসাধারণের মধ্যে বহু রকমের অসন্তোষ বিদ্যমান ছিল। সরকারি স্তরে দুর্নীতি, স্বজন-পোষণ, বেকারি, গণতান্ত্রিক অধিকারের অভাব ইত্যাদির বিরুদ্ধে ছাত্র ও সাধারণ মানুষ একসঙ্গে তখন প্রতিবাদ জানাতো। উপরন্তু তৎকালীন অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি ও বেকারি সাধারণ মানুষকে কমিউনিস্ট শাসনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও সন্দেহগ্রস্ত করে তুলেছিল। মানুষের মধ্যে হতাশা এতটাই চরমে উঠেছিল যে, মনে হচ্ছিল কমিউনিস্ট সরকারের পক্ষে আর তা সামাল দেওয়া সম্ভব হবে না। সাধারণ মানুষ ভাবতে শুরু করেছিল যে মার্কসীয় ভাবাদর্শ তাদের দুঃখকষ্ট লাঘব করতে সক্ষম নয়। হয়তো একটা গণতান্ত্রিক সরকার তাদের দুর্দশা লাঘব করতে পারতো। তাই ছাত্ররা তখন আওয়াজ তুলেছিল, "আমাদের একজন গর্বাচব চাই।"

কিন্তু আজ সেই পরিস্থিতির অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বিশেষ করে আর্থিক ক্ষেত্রে এক নাটকীয় রূপান্তর ঘটেছে। এক দশক আগে দেশের অর্থনীতি ছিল সম্পূর্ণ ভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রণে। তার বদলে আজ সেখানে ব্যক্তি মালিকানায় নিয়ন্ত্রণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাজারমুখী প্রতিযোগিতামূলক

পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা। এর ফলে মার্কসবাদের মূলতত্ত্বের কবর হয়েছে বটে, তবে উৎপাদন বেড়েছে। রাশিয়ার মত চিনের কমিউনিজম মুখ থুবড়ে পড়া থেকে রক্ষা পেয়েছে। বিগত এক দশক ধরে জাতীয় উৎপাদন (GDP) বেড়েছে বহু শতাংশ। উপরন্তু বিদেশী বিনিয়োগ হয়েছে প্রায় ২০০০০ কোটি ডলার এবং আজ চিনের মোট রপ্তানীর প্রায় ৫০ শতাংশ করছে এই সব বিদেশী সংস্থা। ১৯৮৯ সালে যে ব্যক্তিমালিকানা অচ্ছুৎ ছিল, সেই ব্যক্তিমালিকানা আজ চিনা অর্থনীতির প্রায় ৩৫ শতাংশ দখল করেছে।

যাই হোক, এ সবের ফলে বিদেশী বিনিয়োগ বাড়ছে। বাড়ছে উৎপাদন। ব্যক্তি মালিকানা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে সাধারণ মানুষের মধ্যেও। তারা আজ ইচ্ছামত বাড়ি, গাড়ি কিনতে পারছে, এক দশক আগে যা ছিল অকল্পনীয়। ফলে মার্কসবাদ গোল্লায় গেলেও আর্থিক সমৃদ্ধি বাড়ছে। সাধারণ মানুষের আর্থিক ক্ষমতা এতটাই বেড়েছে যে, প্রতি মাসে ১০ লক্ষ নতুন টেলিফোন লাইন দেওয়া হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা খুব শীঘ্রই চিন পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মোবাইল ফোনের বাজারে পরিণত হবে।

এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পার্টির পক্ষ থেকে প্রচার চালানো হচ্ছে যে, রাজনৈতিক সুস্থিরতা না থাকলে আর্থিক ক্ষেত্রে এতটা প্রগতি সম্ভব হত না। বলা হচ্ছে, রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টিকারী ছাত্রদের বন্দুকের গুলি দিয়ে দমন করে দেঙ ঠিক কাজই করেছিল। সাধারণ মানুষও তা আজ বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। বিশেষ করে আজকের নতুন প্রজন্ম আজ আর অশান্তি চাইছে না। তারা ভাবছে সরকার কি করছে না করছে তা বিচার করে কাজ নেই, আর্থিক প্রগতি চালু থাকলেই হল। তাই 'আমরা একজন গর্বাচভ চাই', এই দাবির বদলে তারা বলছে, ''বেঁচে থাক্ দেঙ জিয়াং পিঙের আর্থিক সংস্কার।'' তারাও আজ বিশ্বাস করছে যে, রাজনৈতিক সুস্থিরতা না থাকলে এমন চমকপ্রদ আর্থিক অগ্রগতি কখনই সম্ভব হত না।

কিন্তু এই সব আর্থিক অগ্রগতি সত্ত্বেও বর্তমান চিনের রাজনৈতিক বাতাবরণ যে স্বৈরতান্ত্রিক তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই স্বৈবতান্ত্রিক শাসন মানুষের মূল মানবিক অধিকারগুলোকেও যে অস্বীকার করছে তা বলাই বাহুল্য। চিনের সাধারণ মানুষ চায় বাক্-স্বাধীনতা, চায় মত প্রকাশের স্বাধীনতা, চায় ধর্মাচরণের স্বাধীনতা। কমিউনিস্ট সরকার খাদ্য, বাসস্থান আর মৈথুনের ব্যবস্থা করছে ঠিকই কিন্তু শুধু এসবের দ্বারা পশুরাই সুখী হতে পারে মানুষ নয়। মানুষ চায় আধ্যাত্মিকতা। সূক্ষ্ম মনোবৃত্তিসমূহ প্রকাশের স্বাধীনতা যার কোনো সংস্থান বর্তমান শাসন ব্যবস্থায় নেই।

এই কারণে গণতন্ত্রের প্রতি এক প্রবল আকর্ষণ চিনা জনসাধারণের মধ্যে সর্বদাই বিদ্যমান। জীবনযাত্রার মান উন্নত হবার ফলে এই আকর্ষণ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। কিন্তু জানা নেই যে, কোন্ পথে আসবে সেই গণতন্ত্র। সমস্ত রকম গণতান্ত্রিক আন্দোলন যেখানে নিষিদ্ধ, সেখানে কেমন করে আসবে বহু আকাঙ্ক্ষিত সেই গণতন্ত্র ? সেই গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার মত লোকই বা কোথায় ? দশ বছর আগে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিল সেই ফাঙ লি ঝি, নিউ বেন ইয়ান, বা উই জিঙ লেন-এর মত নেতারা আজ কমিউনিস্ট সরকারের চাকরে পরিণত হয়েছে।

তাই আজ গণতন্ত্রবাদী চিনাদের একমাত্র ভরসা স্থল হল সি. ডি. পি. বা চাইনিজ ডেমোক্রেটিক পার্টি, যারা অতি গোপনে, আন্ডারগ্রাউন্ডে কাজ করে চলেছে, চিনা জনগণের মধ্যে ভবিষ্যৎ গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ভিত্তি তৈরি করে চলেছে। সরকারও বসে নেই। সুযোগ পেলেই তাদের নেতাদের ধরপাকড় করে জেলে ভরে দিচ্ছে। প্রায় ২০ জন প্রথম সারির নেতা এবং কয়েক জন সক্রিয় কর্মী আজ কারারুদ্ধ।

যাই হোক না কেন, প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যে নিরলস ভাবে তারা কাজ করে চলেছে। সমস্ত দেশ জুড়ে আজ সি. ডি. পি.-এর জাল বিস্তৃত। দেশের সমস্ত প্রদেশ থেকে এবং সমস্ত লোকের মধ্যে থেকে এসেছে বেশ কয়েক হাজার সক্রিয় কর্মী। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, গোয়েন্দা বিভাগ যা বলছে তার থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী হয়েছে আজকের সি. ডি. পি. দল।

শ্রী রেন ওয়াং পিং সি. ডি. পি.-এর সর্বোচ্চ নেতাদের মধ্যে একজন। তাঁর বিশ্বাস রাজনৈতিক পরিবর্তন অবশ্যই আসবে। তবে কোনো হঠকারী পদক্ষেপ নেওয়া তিনি সমর্থন করেন না। তাঁর মত হল, ছোট ছোট পদক্ষেপের মধ্য দিয়েই এগিয়ে যেতে হবে। আর একটা তিয়েনানমেন কখনই হতে দেওয়া যাবে না। শ্রী রেন বলেন, "এভাবে মানুষকে ধীরে ধীরে গণতন্ত্রের প্রতি অনুরাগী এবং স্বৈরাচারী কমিউনিস্ট শাসনের প্রতি বিদ্বেষী করে গড়ে তুলতে হবে।... আমরা শুধু আমাদের কৌশলগত দিকগুলোরই পরিবর্তন করেছি, মূল লক্ষ নয়। এইভাবে ক্রমশ আমরা আনবো দ্বিতীয় আর এক বিপ্লব, তবে রক্তপাতের মধ্য দিয়ে নয়। তিয়েনানমেন যে ভুল করেছে তা আর আমরা করব না।"

কিন্তু গত বছর স্বৈরাচারী কমিউনিস্ট সরকার যেভাবে বলপ্রয়োগের মধ্য দিয়ে 'ফালুন গঙ' নামে পরিচিত আধ্যাত্মিক শরীর চর্চাকে দমন করেছে তা থেকে এটাই পরিষ্কার হয় যে, ভবিষ্যতের যে কোনো রকম গণতান্ত্রিক আন্দোলনকেও তারা বর্বরতার সঙ্গেই দমন করবে। সেই রকম পরিস্থিতিতেই সি. ডি. পি.-এর ধীরে চল নীতি কতখানি কার্যকর হবে সেটা সন্দেহের বিষয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, ফালুন-গঙ কর্মীদের উপর সরকারের দমনপীড়ন সাধারণ মানুষের মধ্যেকার গণতান্ত্রিক চেতনাকে জাগ্রত করেছে এবং গণতন্ত্রের প্রতি তাদের আরও বেশি শ্রদ্ধাশীল করে তুলেছে। মানবিক অধিকার সম্পর্কে মানুষ আজ অনেক বেশি সচেতন হয়েছে এবং স্বৈরাচারী কমিউনিস্ট শাসনের প্রতি ঘৃণাও অনেক বেড়েছে। জনগণের মধ্যে এই পরিবর্তন সি. ডি. পি.-এর কর্মীদের মধ্যেও প্রবল উৎসাহের সঞ্চার করেছে।

তাই অনেকের বিশ্বাস অচিরেই হয়তো এমন কোনো ঘটনা ঘটবে যার ফলে চিনের মানুষ গণতন্ত্রের দাবি নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়বে। সে ক্ষেত্রে সি. ডি. পি.-এর পক্ষে নিজেকে আর গোপন রাখা সম্ভব হবে না। জনগণের সঙ্গে তাকেও রাস্তা নামতে হবে। কিছু কিছু ঘটনা এ রকম এক সম্ভাবনারই ইঙ্গিত দিচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, গত বছর ফালুন-গঙ পন্থী ১৩ হাজার কর্মীকে যখন গ্রেপ্তার করা হয় তখন হেবেই (পূর্ব নাম হোপেই) প্রদেশের লোকেরা সরকারের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এক গণ স্বাক্ষর অভিযান শুরু করে এবং সরকারকে ধিক্কার জানায়।

এই সমস্ত কারণে কোনো কোনো রাজনৈতিক মহলের বিশ্বাস যে, বর্তমান চিন সরকারের দমন-পীড়নের নীতি খুবই শীঘ্রই চিনা জনসাধারণের মধ্যে প্রবল এক বিস্ফোরণের সৃষ্টি করবে। ফলে ধীরে ধীরে গণতন্ত্রে উত্তরণের পরিকল্পনা সি. ডি. পি. দ্বারা পরিত্যক্ত হবে। যে কোনো দিন, যে কোনো সময় চিনে সেই ব্যাপক গণতান্ত্রিক বিপ্লব শুরু হয়ে যেতে পারে। এই বিপ্লব রক্তাক্তও হতে পারে, আবার রাশিয়ার পেরেস্ত্রৈকার মত রক্তপাতহীনও হতে পারে। সবই নির্ভর করছে চিনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিক্রিয়ার ওপর। তবে সেই বিপ্লবে চিনের ছাত্র সমাজ যে এক অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে, তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। তাই আশা করা যায় যে, এভাবেই তিয়েনানমেনে নিহত ছাত্রদের স্বপ্ন সাকার হবে। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর মাটি থেকে বর্বর মার্কসবাদী তত্ত্বের বিলুপ্তি ঘটবে।

মার্কসের শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব দিয়ে ইসলামী জিহাদ ব্যাখ্যা করা যায় না

রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী

মার্কসবাদী তত্ত্ব অনুসারে মানব সমাজের মূল চালিকা শক্তি হল অর্থনীতি। মানুষের শারীরিক, মানসিক বৌদ্ধিক ইত্যাদি ইত্যাদি সমস্ত মানবিক দিকগুলোর বিকাশের মূলে রয়েছে অর্থনীতি। অর্থনৈতিক কাঠামোই হল মানব সমাজের মূল কাঠামো। মানুষে মানুষে প্রেম ভালবাসা, হিংসা দ্বেষ, যুদ্ধ বিগ্রহ, হানাহানি, মারামারি সব কিছুর মূলে রয়েছে অর্থনীতি বা মানুষের অর্থনৈতিক বৈষম্য। এই আর্থিক বৈষম্যের ফলেই এই মনুষ্য সমাজ আজ নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। এই শ্রেণীগুলোর মধ্যে কিছু হল শোষক শ্রেণী এবং বাদবাকীগুলো হল শোষিত শ্রেণী। শোষক শ্রেণীগুলোর উদ্দেশ্য হল শোষিত শ্রেণীগুলোকে আর্থিক দিক দিয়ে শোষণ করে নিজেদের পেট মোটা করা। আর শোষিত শ্রেণীগুলোর চেষ্টা হল, এই শোষণের হাত থেকে নিজেদের মুক্ত করা।

মার্কসবাদীদের মতে মানব সমাজের উপরিউক্ত ব্যাখ্যা অভ্রান্ত, সত্য ও সার্বজনীন। তাদের বিশ্বাস, আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত হানাহানি, মারামারি ও যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছে তা হল শোষক ও শোষিত শ্রেণীগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ ও শত্রুতার বহিঃপ্রকাশ। সেই সুদূর অতীতে ক্রীতদাসপ্রথার সমাজব্যবস্থার সময়ে এই সংঘর্ষের সূত্রপাত, তা আজ পুঁজিপতি ও সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যকার সংঘাতে পরিণতি লাভ করেছে। এছাড়া রয়েছে শোষক শ্রেণীগুলোর মধ্যেকার স্বার্থের সংঘাত, যার ফলে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিপতি শ্রেণী নিজেদের মধ্যে পরপর দুটো বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত করেছে।

১৯১৭ সালে বলশেভিক বিপ্লবের ফলে সর্বহারার সোভিয়েত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর এই তত্ত্বের সঙ্গে এক নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। শ্রেণীতে শ্রেণীতে সামাজিক সংঘর্ষ আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র সংঘর্ষে পরিণত হয়েছে। সরাসরি সংঘর্ষ না হলেও, ঠাণ্ডা-লড়াই হিসাবে তা প্রায় ৫০ বছর টিকে থেকেছে। বর্তমানে চীনকে ঘিরে সেই ঠাণ্ডা-লড়াই আবার ফিরে আসার উপক্রম হয়েছে।

যাই হোক, আগেই বলা হয়েছে যে, মার্কসবাদীদের মতে উপরিউক্ত শ্রেণীসংঘর্ষের তত্ত্ব শুধু অভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক সত্যই নয়, বিশ্বজনীনও বটে। তাই তাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই পৃথিবীর যাবতীয় ঐতিহাসিক ঘটনাকে তাদের ওই শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এর ফল হল এই যে, যে সমস্ত বিষয় ওই শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, তাও তারা গায়ের জোরে এবং নানারকমের কুযুক্তি খাড়া করে মার্কসবাদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রমাণ করার কাজে নেমে পড়ল। এটা তাদের পক্ষে খুব জরুরী; কারণ তা না হলে মার্কসবাদকে একটি বিশ্বজনীন তত্ত্ব হিসাবে দাবি করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

তাই দেশ বিভাগের প্রাক্কালে আমাদের মার্কসবাদী নেতা ও বুদ্ধিজীবীরা নানান কুযুক্তি ও অপযুক্তি খাড়া করে মুসলমানদের পাকিস্তানের দাবিকে মার্কসবাদীতত্ত্বের সঙ্গে খাপ খাওয়াবার

কাজে নেমে পড়লেন। তাঁদের মূল উদ্দেশ্য হল এটা প্রমাণ করা যে, মুসলমানদের ওই দাবির মূল উৎস হল অর্থনীতি। উপরন্তু পাকিস্তানের দাবিকে জোরদার করতে মুসলমানরা তখন যে সব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা করল, নির্বিচারে হিন্দু নিধন করল, তাকেও আমাদের মার্কসবাদী নেতারা শোষক শ্রেণী ও শোষিত শ্রেণীর সংঘর্ষ বলে চালাতে চেষ্টা করলেন। এক কথায় তাঁরা প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন যে, ইসলামী জিহাদেরও উৎস হল অর্থনীতি।

তাঁরা তখন ব্যাখ্যা দিলেন যে, পূর্ববঙ্গের সকল জোতদার জমিদারই হিন্দু এবং গরীব কৃষক এবং সকল কৃষিশ্রমিকই মুসলমান এবং ওই হিন্দু জমিদারদের শোষণের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যই গরীব ও শোষিত মুসলমানরা পাকিস্তানের দাবি তুলছে। আর মার্কসবাদীরা যেহেতু শোষিত শ্রেণীর প্রতিনিধি, তাই মুসলমানদের পাকিস্তানের দাবিকে সমর্থন না করে তাঁদের উপায় নেই। তাই আমাদের মার্কসবাদী নেতারা তখন আওয়াজ তুললেন 'মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিতে হবে, দিতে হবে।' আমাদের মহান মার্কসবাদী নেতা জ্যোতি বসু মহাশয় কলকাতার ময়দানে মুসলিম লিগ-এর সঙ্গে এক মঞ্চে সভা করলেন এবং আওয়াজ তুললেন পাকিস্তানের দাবি মানতে হবে, তবেই ভারত স্বাধীন হবে।'

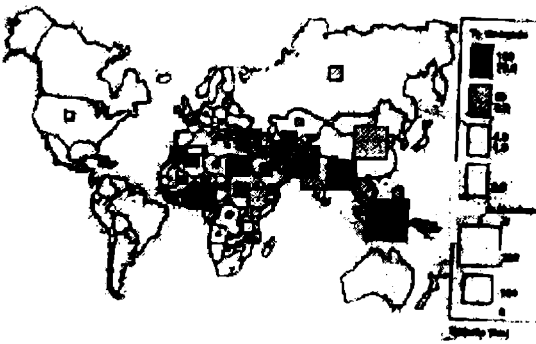
কিন্তু যে কেউ ইসলামী শাস্ত্র সম্বন্ধে সামান্যতম খোঁজ খবর নিলেই দেখতে পাবেন যে, মুসলমানদের পাকিস্তানের দাবির মূল কারণ নিহিত অন্য কোথাও। মার্কসবাদীদের অর্থনৈতিক তত্ত্ব বা শোষক শোষিতের তত্ত্বের সঙ্গে তার কণামাত্রও সম্পর্ক ছিল না।

কোরান, হাদিস ইত্যাদি ইসলামী শাস্ত্রগ্রন্থে যে সমস্ত কথা লেখা আছে তা থেকে বেরিয়ে আসে ইসলামের তিনটি মূল সিদ্ধান্ত। এগুলো হল, (১) মিল্লাৎ ও কুফর, (২) দার-উল-ইসলাম ও দার-উল-হার্ব এবং (৩) জিহাদ। প্রথম সিদ্ধান্ত 'মিল্লাৎ ও কুফর'-এর মিল্লাৎ অর্থ ভাইচারা এবং কুফরের অর্থ বিরুদ্ধতা করা। মিল্লাৎ বলছে যে, পৃথিবীর সমস্ত মুসলমান ভাই ভাই বা 'কুল্ল মুসলেমিন ইখুয়াতুন'। আর যারা মুসলমান নয়, যারা কোরান এবং মহম্মদের নবীত্বে বিশ্বাস করে না তারা হল কুফরকারী কাফের। কোরান বলছে যে, এই কাফেররা হল ঈশ্বরহীন পশু। আল্লা এদের অতিশয় ঘৃণা করেন এবং এদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। মৃত্যুর পর আল্লা তাদের সবাইকে নরকের আগুনে নিক্ষেপ করবেন এবং সেখানে তারা অনন্তকাল শাস্তিভোগ করবে।

দার-উল-ইসলাম বলতে বোঝায় সে সমস্ত দেশ, যেখানে মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দার-উহল-হার্ব-এর আক্ষরিক অর্থ হল 'Land of Violence' বা যুদ্ধ ও সন্ত্রাসের দেশ। বিশেষ অর্থে, এগুলো হল সেই সমস্ত দেশ যেগুলো এখনও মুসলমানদের অধিকারে আসেনি। সেখানে মুসলমানদের সঙ্গে কাফেরদের সংঘর্ষ চলছে। আল্লা বলছেন, 'এই পৃথিবীর সমুদায় সম্পত্তির মালিক হলেন আল্লা ও তাঁর রসুল।' তাই ইসলামের উদ্দেশ্য হল সমগ্র পৃথিবীকে দার-উল-ইসলামে পরিণত করা। সমগ্র পৃথিবীতে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করা। কিন্তু কোন পদ্ধতির সাহায্যে তা করতে হবে? এখানেই ইসলামের তৃতীয় সিদ্ধান্ত জিহাদ-এর আবির্ভাব। জিহাদের মধ্য দিয়ে পৃথিবীব্যাপী ইসলামের সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে হবে।

অনেকে বলেন যে, জিহাদ হল ধর্মযুদ্ধ। কিন্তু তা ঠিক নয়। ধর্মযুদ্ধ বলতে বোঝায় ধর্মের সঙ্গে অধর্মের যুদ্ধ বা ন্যায়ের সঙ্গে অন্যায়ের যুদ্ধ। হিন্দুর কাছে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হল ধর্মযুদ্ধের এক আদর্শ উদাহরণ। সেই ধর্মযুদ্ধে অসামরিক ব্যক্তিই ছিল অবধ্য। নারী ও শিশু হত্যার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

কিন্তু জিহাদ বলতে বোঝায় মুসলমানদের সঙ্গে অমুসলমান কাফেরদের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে নারী, শিশু, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা নির্বিশেষে যে কোন কাফেরই মুসলমানদের কাছে বধযোগ্য। কাফেরদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে বা জিহাদে মুসলমানদের পক্ষে যে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করা কোরান দ্বারা বৈধ।

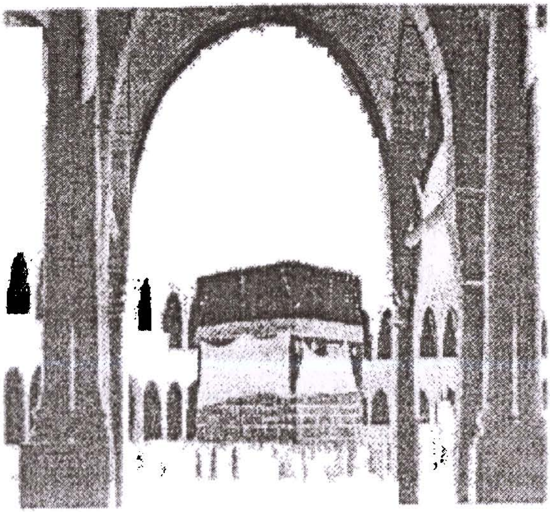


বিশ্বের মুসলিম জনবন্টনের এক চিত্র

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল এই যে, উপরিউক্ত ইসলামী জিহাদের মধ্যে মার্কসবাদের শ্রেণীসংগ্রাম, বা শোষক শ্রেণী ও শোষিত শ্রেণীর মধ্যে সংঘর্ষের অবধারণার লেশমাত্রও অনুপস্থিত। ইসলামী জিহাদকে মার্কসবাদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ তখনই বলা যেত, যদি ইসলামী শাস্ত্র গরীব শোষিত মুসলমানদের শোষক শ্রেণীভূক্ত ধনী মুসলমানদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে বলত। এর ফলশ্রুতি হিসাবেই দেখা গেল যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে হিন্দু জোতদার জমিদারদের সাথে খেটে খাওয়া গরীব, শ্রমজীবী হিন্দুও সমান ভাবে আক্রান্ত হল এবং দেশ থেকে বিতাড়িত হল। পক্ষান্তরে শোষক শ্রেণীভুক্ত একজন জোতদার, জমিদার বা পুঁজিপতি মুসলমানও আক্রান্ত হল না। কিন্তু আমাদের মার্কসবাদীরা ইসলামী জিহাদের যে মার্কসবাদী ব্যাখ্যা প্রস্তুত করেছিলেন, তা সত্য হলে একজন শ্রমজীবী হিন্দুরও আক্রান্ত হবার কথা ছিল না এবং হিন্দু জোতদার জমিদারদের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান জোতদার জমিদারদেরও সমানভাবে আক্রান্ত হওয়া উচিত ছিল।

আরও আশ্চর্যের ব্যাপার হল, দেশ বিভাগ ও পাকিস্তান থেকে ব্যাপক আকারে হিন্দু বিতাড়ণের মধ্য দিয়ে ইসলামী জিহাদের মার্কসবাদী ব্যাখ্যা চরমভাবে ব্যর্থ প্রমাণিত হবার পরও আমাদের মার্কসবাদীরা প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন যে, বর্তমান ব্যাপক ইসলামী সন্ত্রাসবাদের মূল কারণ অর্থনীতি। তাঁদের মতে মুসলমান যুবকদের মধ্যে বেকারত্ব ও হতাশা তাদের সন্ত্রাসবাদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এই অনুমান সত্য বলে ধরে নিলে এর সঙ্গে জড়িত আর একটি বিষয় ব্যাখ্যা করা অসম্ভব হয়ে

পড়ে। যেসব মুসলমান এই সব সন্ত্রাসবাদীদের টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করছে তারা বেকার নয় বা আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল নয়। তা হলে তারা সন্ত্রাসবাদীদের জিহাদ করতে সাহায্য করছে কেন? এর ব্যাখ্যা মার্কসবাদীদের কাছে নেই।



মক্কার কাবা। আরব সাম্রাজ্যবাদের কেন্দ্রস্থল।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হবে যে, সব মুসলমান যুবকরা আর্থিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী হলেও ইসলামী জিহাদ বা সন্ত্রাসবাদ বন্ধ হবে না। যতদিন এই পৃথিবীর বুকে একটিও দার-উল-হার্ব থাকবে, ততদিন ইসলামী সন্ত্রাসবাদও থাকবে। কারণ ইসলামী সন্ত্রাসের উৎস আর্থিক বৈষম্য নয়। এর উৎস পৃথিবীব্যাপী ইসলামী বা আরব্য সাম্রাজ্য গড়ে তোলার ইসলামী নির্দেশ।

মার্কসবাদীদের কাছে এটা সন্তুষ্টির কারণ হতে পারে যে, ইসলামী জিহাদের মূলেও রয়েছে অর্থনীতি। তা হল কাফেরদের ধন-সম্পত্তি আত্মসাৎ করে ধনবান হবার এক সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টা। কিন্তু মার্কসবাদীদের কাছে যে কোন রকমের সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টাই অমানবিক এবং নিন্দনীয়। সেই কারণেই তাঁরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে গালি না দিয়ে জলগ্রহণ করেন না। সুতরাং সেই দিক থেকে বিচার করলে, মার্কসবাদীদের উচিত ইসলামী সাম্রাজ্যবাদকেও সমানভাবে নিন্দা করা।

এ ব্যাপারে আরও একটা বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা প্রয়োজন। মার্কসবাদীরা ক্রীতদাস প্রথার ভীষণ বিরোধী, কিন্তু ইসলাম সেই ক্রীতদাসপ্রথার পৃষ্ঠপোষক। সমাজের কোন্ ব্যক্তি কত ধনশালী, প্রাক-ইসলাম আরবে তার মাপকাঠি ছিল কার কত উট আছে। কিন্তু ইসলামের আগমনের পরে কার কত ক্রীতদাস আছে সেটাই আর্থিক স্বচ্ছলতার মাপকাঠিতে পরিণত হয়। নবীর চাচাত

ভাই যুবায়ের ১০০০ ক্রীতদাসের মালিক হবার সুবাদে আরবের সর্বাপেক্ষা ধনী ব্যক্তিতে পরিণত হন। ৭১২ সালে মহম্মদ বিন কাসেম সিন্ধুদেশ জয় করার পর লক্ষ লক্ষ হিন্দু নারী ও শিশুকে বাগদাদ ও দামাস্কাসে পাঠায় এবং সেখানের হাটে তাদের বিক্রি করা হয়। সেই সময় খলিফা মুয়াইয়ার প্রধান সহকারী এবং ইরাকের শাসক আল হাজাজ মারা যাবার পর তার জেলখানাগুলোতে দেখা যায় প্রায় ৫০ হাজার হিন্দু ক্রীতদাসকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। অনেকে ভাবতে পারেন যে, এইসব বিগত দিনের কথা। আজকের ইসলাম ক্রীতদাস প্রথাকে সমর্থন করে না। সে ব্যাপারে বলতে হয় যে, সৌদি আরবে আজও ক্রীতদাস প্রথা চালু আছে। বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন ইত্যাদি দেশ থেকে গরীব ঘরের মুসলমান শিশুদের চোরাইপথে সৌদি আরবে আনা হয় এবং আরবের শেখরা তাদের পয়সা দিয়ে কিনে ক্রীতদাস হিসাবে ব্যবহার করে।

শেষ কথা হিসাবে বলা যায় যে, মার্কসবাদ এই মানব সমাজকে শ্রমিক, কৃষক, বুর্জোয়া, পেটিবুর্জোয়া, সামন্ত প্রভু, ভূমিদাস ইত্যাদি বহু শ্রেণীতে ভাগ করে এবং এই শ্রেণীবিভাগের ভিত্তি হল আর্থিক বৈষম্য। কিন্তু ইসলাম এই মানব সমাজকে ভাগ করে মাত্র দুটি শ্রেণীতে, মুসলমান শ্রেণী ও কাফের শ্রেণী। মার্কসবাদের উদ্দেশ্য হল শোষণহীন সমাজ তৈরি করা। পক্ষান্তরে ইসলামের উদ্দেশ্য হল, কাফের শ্রেণীকে নির্মূল করে সারা পৃথিবীকে ইসলামী সাম্রাজ্যে বা আরব্য সংস্কৃতির সাম্রাজ্যে পরিণত করা। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই তারা পৃথিবীব্যাপী ধ্বংসাত্মক কাজ বা জিহাদ চালিয়ে যাচ্ছে।

সব থেকে বড় কথা হল, ইসলাম মানব সমাজকে যে দুই শ্রেণী, মুসলমান শ্রেণী ও কাফের শ্রেণীতে বিভক্ত করে, তার ভিত্তি অর্থনীতি বা আর্থিক বৈষম্য নয়। আর এই মূল তফাতের জন্যই মার্কসবাদের সাহায্যে ইসলামী জিহাদকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

পরিশিষ্ট—১

ভারতের বৃটিশ শাসন

কার্ল মার্কস

লন্ডন, শুক্রবার, ১০ই জুন, ১৮৫৩

.........হিন্দুস্থান যেন এশীয় আয়তনের এক ইতালি, হিমালয় তার আল্পস্, বাংলার সমভূমি যেন তার লম্বার্দি সমভূমি, দাক্ষিণাত্য তার অ্যাপেনাইন এবং সিংহল তার সিসিলি দ্বীপ। জমির উৎপন্নের সেই একই সমৃদ্ধ বৈচিত্র্য এবং রাজনৈতিক চেহারায় সেই একই খণ্ড খণ্ড ভাব। বিজয়ীর তরবারির চাপে ইতালি যেমন মাঝে মাঝে বিভিন্ন জাতির সমষ্টিতে সংহত হয়েছে, তেমনি দেখা যায় হিন্দুস্থানেও মুসলমান বা মোগল বা বৃটেনদের চাপ যখন থাকেনি, তখন হিন্দুস্থানও যতগুলি বিবদমান স্বাধীন রাষ্ট্রে ভেঙে গেছে তার সংখ্যা হিন্দুস্থানের নগর এমন কি গ্রামগুলির সংখ্যার মতো। তবু সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে হিন্দুস্থান ইতালি নয়, প্রাচ্যের আয়ার্ল্যান্ড। এবং ইতালি ও আয়র্ল্যান্ড—ভোগবিলাসী এক জগতের সঙ্গে দুর্দশার এক জগতের এই বিচিত্র মিলন—তা হিন্দুস্থানের প্রাচীন ধর্মীয় ঐতিহ্যের মধ্যেই সূচিত। এ ধর্ম যুগপৎ ইন্দ্রিয়াতিশয্য ও আত্মনিগ্রহী কৃচ্ছ্রসাধনের ধর্ম, লিঙ্গম্ আর জগন্নাথদেবের ধর্ম, সন্ন্যাসী ও বায়াদেবের (দেবদাসীর) ধর্ম।

যাঁরা হিন্দুস্থানের স্বর্ণযুগে বিশ্বাস করেন তাঁদের সঙ্গে আমি একমত নই, তবে নিজের বক্তব্যের সমর্থনে আমি স্যার চার্লস উডের মতো কুলিখাঁর নজির দেব না। কিন্তু দৃষ্টান্তস্বরূপ আওরঙ্গজেবের সময়টা ধরা যাক, অথবা উত্তরে যখন মোগল এবং দক্ষিণে পোর্তুগীজদের উদয় হল সেই যুগটা মুসলিম অভিযান ও দাক্ষিণাত্যের হেপ্তার্কির যুগই। কিংবা চাই কি, আরো পুরাকালে গিয়ে খাস ব্রাহ্মণদের পৌরাণিক ইতিবৃত্তটাকেই নেওয়া যাক—তাতে ভারতীয় দুর্দশার প্রারম্ভ বলে যে কাল-নির্দেশ হয়েছে, সেটা খ্রিস্টীয় ধারণানুসারে বিশ্বসৃষ্টিরও আগে।

অবশ্য এতে কোনো সন্দেহই নেই যে বৃটিশরা হিন্দুস্থানের উপর যে দুর্দশা চাপিয়েছে তা হিন্দুস্থানের আগের সমস্ত দুর্দশার চাইতে মূলগতভাবে পৃথক এবং অনেক বেশি তীব্র। বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এশীয় স্বৈরাচারের ওপর ইউরোপীয় স্বৈরাচারের পতন ঘটিয়ে সালসেট মন্দিরের রোমহর্ষক স্বর্গীয় দানবদের চাইতেও বেশি যে দানবীয় এক জরাসন্ধ সৃষ্টি করেছে তার কথা আমি বলছি না। বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের কোনো বৈশিষ্ট্যসূচক দিক এটা নয়—এ হল শুধুই ওলন্দাজদের অনুকরণ এবং এতখানি অনুকরণ যে বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্রিয়াকলাপের সংজ্ঞা দিতে হলে জাভার ইংরেজ লাট স্যার স্ট্যামফোর্ড রাফলস অতীতের ওলন্দাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সম্পর্কে যা বলেছিলেন, তার আক্ষরিক পুনরাবৃত্তি করলেই যথেষ্ট।

'ওলন্দাজ কোম্পানি শুধুমাত্র লাভের লালসায় প্ররোচিত হয়েছিল এবং আগে ওয়েস্ট ইন্ডিয়ার বাগান-মালিক বাগানের কুলিবাহিনীকে যে দৃষ্টিতে দেখত তার চেয়েও কম শ্রদ্ধা ও কম বিবেচনার সঙ্গে তারা দেখত তাদের প্রজাদের, কারণ বাগান-মালিক মনুষ্যসম্পদ ক্রয় করার জন্যে টাকা

দিতে হয়েছিল, এদের দিতে হয়নি। এ কোম্পানি স্বেচ্ছাতন্ত্রের সবখানি প্রচলিত যন্ত্র প্রয়োগ করেছিল লোকগুলোর কাছ থেকে যত বেশি পারা যায় আদায় করার জন্যে, নিংড়ে নেবার জন্যে তাদের মেহনতের শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত এবং এইভাবে খামখেয়ালী ও অর্ধবর্বর এবং সরকারজনিত কুফল বাড়িয়ে তুলত রাজনীতিকদের অভ্যস্ত সবখানি ধূর্ততা ও ব্যবসায়ীদের সবখানি একচেটিয়া স্বার্থপরতার সঙ্গে সে যন্ত্রকে পরিচালিত করে।'

হিন্দুস্থানের সমস্ত ঘটনা পরম্পরা যতই বিচিত্র রকমের জটিল, দ্রুত ও বিধ্বংসকারী বলে মনে হোক না কেন, এই সবকিছু গৃহযুদ্ধ, অভিযান, উৎসব, দিগ্বিজয় ও দুর্ভিক্ষ তার উপরিভাগের নিচে নামেনি। ইংলন্ডই ভারতীয় সমাজের সমগ্র কাঠামোটাই ভেঙে দিয়েছে, পুনর্গঠন কোনো লক্ষণ এখনো অদৃশ্য। পুরানো জগতের অপহৃত অথচ নতুন কোনো জগতের এই অপ্রাপ্তির ফলে হিন্দুদের বর্তমান দুর্দশার ওপর একটা বিশেষ রকমের বিষাদের আবির্ভাব ঘটেছে ও বৃটেন-শাসিত হিন্দুস্থান তার সমস্ত অতীত ঐতিহ্য, তার সমগ্র অতীত ইতিহাস থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছে।

এশিয়ায় স্মরণাতীত কাল থেকে সরকারের সাধারণত শুধু তিনটি বিভাগ বর্তমান ছিল ঃ অর্থবিভাগ অর্থাৎ অভ্যন্তর লুণ্ঠনের বিভাগ, যুদ্ধ অর্থাৎ বহির্দেশ লুণ্ঠনের বিভাগ এবং পরিশেষে পূর্তকর্মের বিভাগ। আবহাওয়া ও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের জন্যে, বিশেষ করে সাহারা থেকে শুরু করে আরব, পারস্য, ভারত ও তাতারিয়ার মধ্যে দিয়ে সমুন্নত এশীয় মালভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত বৃহৎ বৃহৎ মরু-অঞ্চলের অস্তিত্বের ফলে খাল ও জলাশয় দিয়ে কৃত্রিম সেচ ছিল প্রাচ্য কৃষির ভিত্তি। যেমন মিশর ও ভারতে, তেমনি মেসোপটেমিয়া, পারস্য প্রভৃতি দেশেও বন্যার জল দিয়ে ভূমির উর্বরতা সাধন করা হয়; জলের স্ফীতির সুবিধা নিয়ে সেচের খালগুলিতে জলের-জোগান দেওয়া হয়। বিনা অপচয়ে সমবেতভাবে জল ব্যবহারের এই প্রাথমিক যে প্রয়োজন থেকে প্রতীচ্যে যেমন, ফ্ল্যান্ডার্স ও ইতালির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগগুলি স্বেচ্ছামূলক সমিতিতে আবদ্ধ হতে এগিয়েছিল, তার জন্যে প্রাচ্যে দরকার হয়েছিল সরকারের কেন্দ্রীয় ক্ষমতার হস্তক্ষেপ—এ প্রাচ্যে সভ্যতা ছিল অতি নিচের স্তরে এবং অঞ্চলের ব্যাপ্তি এত বিপুল যে, স্বেচ্ছামূলক সমিতি সম্ভব ছিল না। সুতরাং সমস্ত এশীয় সরকারগুলির ওপরেই এসে বর্তায় একটি অর্থনৈতিক দায়িত্ব—পূর্তকর্ম সংগঠনের কাজ। ভূমির এই যে কৃত্রিম উর্বরীকরণ কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর নির্ভরশীল এবং সেচ ও জল-নিঃসরণ ব্যবস্থার অবহেলার সঙ্গে সঙ্গেই যা ক্ষয় পেতে থাকে, তা থেকেই আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি এই অন্যথা-বিচিত্র ঘটনাটির—কেন আমরা পালমিরা ও পেত্রায়, ইয়েমেনের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে এবং মিশর, পারস্য ও হিন্দুস্থানের বড়ো বড়ো প্রদেশে দেখি একদা অতি উত্তমরূপে কর্ষিত গোটাগুটি এক একটা এলাকা আজ বন্ধ্যা ও মরুভূমি হয়ে পড়ে আছে। এ থেকেও ব্যাখ্যা করা যায় কেমন করে একটি মাত্র বিধ্বংসী যুদ্ধেই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে একটি দেশ জনশূন্য হয়ে পড়ে থাকে, তার সমস্ত সভ্যতা লোপ পায়।

পূর্ব ভারতে বৃটিশ তাদের পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে অর্থ ও যুদ্ধের বিভাগটি গ্রহণ করেছিল বটে, কিন্তু পূর্তকর্মটা একেবারেই অবহেলা করেছে। সেই জন্যেই কৃষির এ অবনতি, অবাধ প্রতিযোগিতার বৃটিশ নীতি—laissez faire, laissez aller এই নীতিতে এ কৃষি পরিচালিত

হতে পারে না। কিন্তু এশীয় সাম্রাজ্যগুলিতে কৃষি এক সরকারের আমলে অবনত হচ্ছে আবার অন্য সরকরের আমলে উন্নত হচ্ছে, এ দেখতে আমরা বেশ অভ্যস্ত। ইউরোপে যেমন ভালো মন্দ ঋতু অনুসারে ফসলের অবস্থা বদলায়, ওখানে তেমনি বদলায় ভালোমন্দ সরকার অনুসারে। সুতরাং কৃষির পীড়ন ও অবহেলা খারাপ জিনিস হলেও ভারতীয় সমাজের ওপর সেইটা বৃটিশ অভিযানকারীদের চূড়ান্ত আঘাত বলে গণ্য না করা সম্ভব হত, যদি এর সঙ্গে একেবারে অন্য রকম গুরুত্বের একটি পরিস্থিতি, সমগ্র এশীয় জগতের ইতিহাসের পক্ষেই যা অভিনব, তার সংযোগ না ঘটত। ভারতীয় অতীতের রাজনৈতিক চেহারাটা যতই পরিবর্তনশীল বলে মনে হোক না কেন, সুদূর পুরাকাল থেকে উনিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত তার সামাজিক অবস্থা অপরিবর্তিত থেকেছে। সে সমাজ-কাঠামোর খুঁটি হল হস্তচালিত তাঁত আর চরকা, যা থেকে নিয়মিতভাবে তাঁতী আর সুতাকাটুনির অক্ষৌহিণী সৃষ্টি হয়ে চলেছে। স্মরণাতীত কাল থেকে ইউরোপ ভারতীয় শ্রমের অপূর্ব বস্ত্র পেয়ে এসেছে এবং তার বদলে পাঠিয়েছে তার বহুমূল্য ধাতু। সে ধাতু পৌঁছিয়েছে ভারতের স্বর্ণকারের কাছে, ভারতীয় সমাজের এক আবশ্যিক সদস্য সে—এ সমাজে অলঙ্কার-প্রিয়তা এত বেশি যে নিম্নতম শ্রেণীর লোকেরা পর্যন্ত, যারা প্রায় নগ্নগায়ে ঘোরে তারাও অসাধারণ এক জোড়া সোনার মাকড়ি আর গলায় কোনো না কোনো রকমের সোনার গহনা পরে। হাত-পায়ের আঙুলে আংটি পরাও খুব চল। নারী ও ছেলেমেয়েরা প্রায়ই পরে ভারি ভারি কঙ্কণ আর সোনা রূপোর মল, এবং ঘরে দেখতে পাওয়া যায় সোনারূপোর তৈরি দেবদেবীর মূর্তি। বৃটিশ হামলাদাররাই এসে ভারতীয় তাঁত ভেঙে ফেলে, ধ্বংস করে চরকা। ইংলন্ড শুরু করে ইউরোপের বাজার থেকে ভারতীয় তুলাবস্ত্রকে বিতাড়ন করে; অতঃপর সে হিন্দুস্থানে সুতা পাঠাতে থাকে এবং পরিশেষে তুলার মাতৃভূমিকেই কার্পাস বস্ত্র চালান দিয়ে ভাসিয়ে দেয়। ১৮১৮ থেকে ১৮৩৬ সাল পর্যন্ত গ্রেট বৃটেন থেকে ভারতে সুতা চালানোর অনুপাত বেড়ে ওঠে ১ থেকে ৫,২০০ গুণ। ১৮২৪ সালে ভারতে বৃটিশ মসলিনের চালান ১০,০০,০০০ গজও প্রায় নয়, অথচ ১৮৩৭ সালে তা ৬,৪০,০০,০০০ গজও ছাড়িয়ে যায়, অথচ একই সময়ে ঢাকায় জনসংখ্যা ১,৫০,০০০ থেকে ২০,০০০-এ নেমে আসে। শিল্পের জন্যে বিখ্যাত এই সব ভারতীয় শহরগুলির অবক্ষয়টুকু কিন্তু সর্বনিকৃষ্ট ফলাফল নয়। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে কৃষি ও হস্তচালিত শিল্পের যে ঐক্য ছিল বৃটিশ বাষ্প ও বিজ্ঞান তাকে উন্মূলিত করে দিয়েছে।

এই দুটি অবস্থা—একদিকে সকল প্রাচ্যবাসীর মতো হিন্দু কর্তৃক তার কৃষি ও বাণিজ্যের প্রাথমিক শর্তস্বরূপ বড়ো বড়ো পূর্তকর্মের ভার কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর অর্পণ, এবং অন্যদিকে সারা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা এবং কৃষি ও শিল্পোদ্যোগের ঘরোয়া বন্ধনে তাদের ছোটো ছোটো কেন্দ্রে জোট বন্ধ —তথাকথিত গ্রাম-ব্যবস্থায় সৃষ্টি করেছে, তাতে এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিটি সম্মিলন পেয়েছে স্বাধীন সংগঠন ও বিশিষ্ট জীবনধারা। এই ব্যবস্থার বিশিষ্ট চরিত্র বোঝা যাবে ভারত বিষয়ে বৃটিশ কমন্স সভার একটি পুরনো সরকারী দলিলের নিম্নোক্ত বর্ণনা থেকে ঃ

"ভৌগোলিকভাবে দেখলে একটি গ্রাম হল কয়েক শত বা কয়েক হাজার একর আবাদী বা পতিত জমির এক একটি অঞ্চল, রাজনৈতিকভাবে দেখলে তার ধরণটা কর্পোরেশন বা পৌর

গোষ্ঠীর মতো। তার পরিচালক ও সেবকদের ব্যবস্থাপনা নিম্নোক্ত ধরনের : **পটেল** [potail] অথবা প্রধান মণ্ডল, তার ওপর সাধারণত গ্রামের অবস্থা-ব্যবস্থার তদারক করার ভার, অধিবাসীদের মধ্যেকার ঝগড়ার সে মীমাংসা করে, পুলিসের কাজ দেখে, এবং স্ব-গ্রামের অভ্যন্তর থেকে রাজস্ব-সংগ্রহের কাজ চালায়—ব্যক্তিগত প্রভাব এবং গ্রামবাসীদের অবস্থা ও স্বার্থের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ পরিচয়ের ফলে এ দায়িত্বের পক্ষে সে হয় সবেচেয়ে উপযোগী। **কার্নম** [kurnum] চাষের হিসাব রাখে এবং চাষ সংক্রান্ত সবিকিছু নথিবদ্ধ করে। **তৈলাব** [tallier] আর **তোত্তী** [totie]—প্রথম জনের কাজ অপরাধাদির সংবাদ সংগ্রহ এবং গ্রাম থেকে গ্রামান্তর গমনাগমনে লোকজনকে পৌছে দেওয়া ও বক্ষা করা; অপর জনের এখতিয়ার গ্রামেই সীমাবদ্ধ বলে মনে হয়, অন্যান্য কাজ ছাড়াও তার কাজ হল শস্য পাহারা দেওয়া এবং তার পরিমাপে সাহায্য করা। **সীমানাদার**—তার কাজ গ্রামের সীমানা রক্ষা এবং কলহ উপস্থিত হলে সীমানা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া। জলাশয় ও জলপ্রণালীর তত্ত্বাবধায়ক কৃষির জন্যে জলের বিলি ব্যবস্থা করা। ব্রাহ্মণ করে গ্রামের পূজা-অর্চনা। গুরুমশায়কে দেখা যায় গ্রামের ছেলেপিলেদের বালির উপর লিখতে-পড়তে শেখাচ্ছেন। পঞ্জিকা ব্রাহ্মণ অথবা জ্যোতিষী ইত্যাদি সব পরিচালক ও সেবকদের নিয়েই সাধারণত গ্রামের ব্যবস্থাপনা; কিন্তু দেশের কোনো কোনো অঞ্চলে সে ব্যবস্থাপনা এত প্রসারিত নয়, উপরিকথিত দায়-দায়িত্বের কতকগুলি একই ব্যক্তি পালন করে। আবার কোনো কোনো অঞ্চলে উপরিকথিত লোক ছাড়াও অনেক বেশি লোক দেখা যায়। এই প্রাথমিক ধরনের পৌরশাসনের আওতায় স্মরণাতীত কাল থেকে এ দেশবাসী বাস করে আসছে। গ্রামের সীমানা বদল হয়েছে ক্বচিৎ; এবং যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ বা মারীমড়কে গ্রামগুলি ক্ষতিগ্রস্ত এমনকী বিধ্বস্ত হলেও সেই একই নাম, একই সীমানা, একই স্বার্থ, এমনকী একই পরিবারসমূহ চলে এসেছে যুগের পর যুগ। রাজ্যের ভাঙাভাঙি ভাগবিভাগ নিয়ে অধিবাসীরা মাথা ঘামায় না; গ্রামটি অখণ্ড হয়ে থাকলেই হল, কোন্ শক্তির কাছে তা গেল, কোন্ সম্রাটের তা করায়ত্ত হল এ নিয়ে তারা ভাবে না—গ্রামের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি অপরিবর্তিতই থাকে। সেই একই পটেল থাকে প্রধান মণ্ডল তথা ক্ষুদে বিচারপতি বা শাসনকর্তা এবং গ্রামের কর আদায়ের কাজ সে তখনো চালিয়ে যায়।

এই সব ছোট ছোট বাঁধিগৎ ধরনের সামাজিক সত্তাগুলি বহুলাংশে ভেঙে গেছে ও অদৃশ্য হয়ে চলেছে, সেটা বৃটিশ ট্যাক্স-সংগ্রাহক ও বৃটিশ সৈন্যের বর্বর হস্তক্ষেপের ফলে তত নয় যতটা ইংরেজের বাষ্প ও ইংরেজের অবাধ বাণিজ্যের ক্রিয়ায়। ঐ সব পারিবারিক গোষ্ঠীগুলির ভিত্তি ছিল কুটির শিল্প—হাতে কাটা সূতা, হাতে বোনা কাপড় ও হাতে করা চাষের এমন এক বিশিষ্ট সমন্বয়, যা থেকে তারা পেত আত্মনির্ভর শক্তি। ইংরেজের হস্তক্ষেপ সূতাকাটুনির স্থান করেছে ল্যাঙ্কাশায়ারে এবং তাঁতীর স্থান রেখেছে, বাংলায়, অথবা হিন্দু সূতাকাটুনি ও তাঁতী উভয়কেই নিশ্চিহ্ন করে এই সব ছোটো ছোটো অর্ধবর্বর, অর্ধসভ্য গোষ্ঠীগুলিকে ভেঙে দিয়েছে তাদের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে উড়িয়ে দিয়ে এবং এই ভাবে যে সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত করেছে সেটা এশিয়ায় যা শোনা গেছে তার মধ্যে সর্ববৃহৎ, সত্যি কথা বললে একমাত্র বিপ্লব।

ঐ সব লক্ষ লক্ষ শ্রমপরায়ণ পিতৃতান্ত্রিক ও নিরীহ সামাজিক সংগঠনগুলি অসংগঠিত হয়ে চূর্ণ চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে, ডুবছে দুর্দশার এক সমুদ্রে, সে সংগঠনের সদস্যদের কাছ থেকে হারিয়ে

যাচ্ছে যুগপৎ তাদের প্রাচীন সভ্যতা ও জীবিকার্জনের বংশানুক্রমিক উপায়—দেখতে এটা মানবিক অনুভূতির কাছে যতই পীড়াদায়ক হোক না কেন, এ কথা যেন না ভুলি যে এই সব শান্ত-সরল [idyllic] গ্রাম-গোষ্ঠীগুলি যতই নিরীহ মনে হোক, প্রাচ্য স্বৈরাচারের তারাই দৃঢ় ভিত্তি হয়ে এসেছে চিরকাল, মনুষ্য-মানসকে তারাই যথাসম্ভব ক্ষুদ্রতম পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে, তাকে বানিয়েছে কুসংস্কারের অবাধ ক্রীড়নক, তাকে করেছে চিরাচরিত নিয়মের ক্রীতদাস, হরণ করেছে তার সমস্ত কিছু মহিমা ও ঐতিহাসিক কর্মদ্যোতনা। যে বর্বর আত্মপরতা কোনো একটা শোচনীয় ভূমিখণ্ড আঁকড়ে শান্তভাবে প্রত্যক্ষ করে গেছে সাম্রাজ্যের পতন, অবর্ণনীয় নিষ্ঠুরতার অনুষ্ঠান, বড়ো শহরের অধিবাসিগণের হত্যাকাণ্ড, প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর চাইতে বেশি কিছু ভাবেনি এদের; এবং দৈবাৎ আক্রমণকারীর লক্ষ্যপথে পড়লে যা নিজেও হয়ে উঠেছে আক্রমণকারীর এক অসহায় শিকার, সে আত্মপরতার কথা যেন না ভুলি। যেন না ভুলি যে এই হীন, অচল ও উদ্ভিদসুলভ জীবন, এই নিষ্ক্রিয় ধরনের অস্তিত্ব থেকে অন্যদিকে, তার পাল্টা হিসাবে সৃষ্টি হয়েছে বন্য লক্ষ্যহীন এক অপরিসীম ধ্বংসশক্তি এবং হত্যা ব্যাপারটিকেই হিন্দুস্থানে পরিণত করেছে এক ধর্মীয় প্রথায়। যেন না ভুলি যে ছোটো ছোটো এই সব গোষ্ঠী ছিল জাতিভেদপ্রথা ও ক্রীতদাসত্ব দ্বারা কলুষিত, অবস্থার প্রভুরূপে মানুষকে উন্নত না করে তাকে করেছে বাইরের অবস্থার পদানত, স্বয়ং-বিকশিত একটি সমাজ-ব্যবস্থাকে তারা পরিণত করেছে অপরিবর্তমান প্রাকৃতিক নিয়তিরূপে এবং এইভাবে আমদানি করেছে প্রকৃতির এমন পূজা যা পশু করে তোলে লোককে, প্রকৃতির প্রভু যে মানুষ তাকে হনুমানদেব রূপী বানর এবং শরলাদেবী রূপী গোরুর অর্চনায় ভূলুণ্ঠিত করে অধঃপতনের প্রমাণ দিয়েছে।

এ কথা সত্য যে, ইংলন্ড হিন্দুস্থানে সামাজিক বিপ্লব ঘটাতে গিয়ে প্ররোচিত হয়েছিল শুধু হীনতম স্বার্থবুদ্ধি থেকে, এবং সে স্বার্থসাধনে তার আচরণ ছিল নির্বোধের মতো। কিন্তু সেটা প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হল : এশিয়ার সামাজিক অবস্থায় মৌলিক একটা বিপ্লব ছাড়া মনুষ্যজাতি কি তার ভবিতব্য সাধন করে পারে? যদি না পারে, তাহলে ইংলন্ডের যত অপরাধই থাক, সে বিপ্লব সংঘটনে ইংলন্ড ছিল ইতিহাসের অচেতন অস্ত্র।

তাহলে, আমাদের ব্যক্তিগত অনুভূতির কাছে প্রাচীন এক জগতের ভেঙে পড়ার দৃশ্য যত কটু লাগুক, ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমাদের অধিকার রয়েছে গ্যেটের সঙ্গে ঘোষণা করার ঃ

> "Sollte diese Qual uns qualen,
> Da sie unsre Lust vermehrt,
> Hat nicht Myriaden Seelen
> Timur's Herrschaft aufgezehrt?"

কার্ল মার্কস কর্তৃক ১৮৫৩ সংবাদ পত্রের পাঠ অনুসারে
১০ই জুন লিখিত ইংরেজি থেকে ভাষান্তর
New-York Daily Trabune পত্রিকায়
১৮৫৩ সালের ২৫শে জুন প্রকাশিত।

পরিশিষ্ট—২

ভারতের বৃটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ ফলাফল

কার্ল মার্ক্‌স

লন্ডন, শুক্রবার, ২২শে জুলাই, ১৮৫৩

.........ইংরেজ প্রভুত্ব ভারতে প্রতিষ্ঠিত হল কী করে? মহা মোগলের একচ্ছত্র ক্ষমতা ভেঙে ফেলেছিল মোগল শাসনকর্তরা। শাসনকর্তাদের ক্ষমতা চূর্ণ করল মারাঠারা। মারাঠাদের ক্ষমতা ভাঙল আফগানরা; এবং সবাই যখন সবার সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত, তখন প্রবেশ করল বৃটেন এবং সকলকেই অধীন করতে সক্ষম হল। দেশটা শুধু হিন্দু আর মুসলমানেই বিভক্ত নয়, বিভক্ত উপজাতিতে, বর্ণাশ্রমজাতিভেদে; এমন একটা স্থিতিসাম্যের ভিত্তিতে সমাজটার কাঠামো গড়ে উঠেছিল যা এসেছে সমাজের সকল সভ্যদের মধ্যস্থ একটা সাধারণ বিরাগ ও প্রথাবদ্ধ পরস্পর বিচ্ছিন্নতা থেকে;—এমন একটা দেশ ও এমন একটা সমাজ, সে কি বিজয়ের এক অবধারিত শিকার হয়েই ছিল না? হিন্দুস্থানের অতীত ইতিহাস না জানলেও অন্তত এই একটি মস্ত ও অবিসংবাদী তথ্য তো রয়েছে যে এমন কি এই মুহূর্তেও ভারত ইংরেজ রাজ্যভুক্ত হয়ে আছে ভারতেরই খরচে পোষিত এক ভারতীয় সৈন্যবাহিনী দ্বারাই! বিজিত হবার নিয়তি ভারত তাই এড়াতে পারত না; এবং তার অতীত ইতিহাস বলতে যদি কিছু থাকে তো তার সবখানি হল পরপর বিজিত হবার ইতিহাস। ভারত সমাজের কোনো ইতিহাসই নেই—অন্তত জানা কোনো ইতিহাস। ভারতে ইতিহাস বলে যা বলি, সে শুধু একের পর এক বহিরাক্রমণকারীর ইতিহাস, যারা ঐ অপ্রতিরোধী ও অপরিবর্তমান সমাজের নিষ্ক্রিয় ভিত্তিতে তাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে গেছে। ভারত বিজয়ের অধিকার ইংরেজের ছিল কিনা, এটা তাই প্রশ্ন নয়; প্রশ্ন এই তুর্কী, পারসীক কি রুশদের দ্বারা ভারত বিজয় কি বৃটেনদের দ্বারা ভারত বিজয়ের চেয়ে শ্রেয় বলে ভাবব?

ভারতবর্ষে এক দ্বিবিধ কর্তব্য পালন করতে হবে ইংলন্ডকে; একটি ধ্বংসমূলক এবং অন্যটি উজ্জীবনমূলক—পুরাতন এশীয় সমাজের ধ্বংস এবং এশিয়ায় পাশ্চাত্য সমাজের বৈষয়িক ভিত্তির প্রতিষ্ঠা।

আরবী, তুর্কী, তাতার, মোগল, যারা একের পর এক ভারত প্লাবিত করেছে তারা অচিরেই হিন্দুভূত হয়ে গেছে; ইতিহাসের এক চিরন্তন নিয়ম অনুসারে বর্বর বিজয়ীরা নিজেরাই বিজিত হয়েছে তাদের প্রজাদের উন্নতর সভ্যতায়। বৃটিশরাই হল প্রথম বিজয়ী যারা হিন্দু সভ্যতার চেয়ে

উন্নত এবং সেই হেতু তার কাছে অনধিগম্য। দেশীয় গোষ্ঠীগুলিকে ভেঙে দিয়ে, দেশীয় শিল্পকে উন্মূলিত করে এবং দেশীয় সমাজে যা কিছু মহৎ ও উন্নত ছিল তাকে সমতল করে দিয়ে বৃটিশেরা সে সভ্যতাকে চূর্ণ করে। তাদের ভারত শাসনের ঐতিহাসিক পাতাগুলো থেকে এই ধ্বংসের অতিরিক্ত কিছু পাওয়া যায় না বললেই হয়। স্তূপাকৃতি ধ্বংসের মধ্য থেকে উজ্জীবনের ক্রিয়া প্রায় লক্ষ্যেই পড়ে না। তা সত্ত্বেও সে ক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে।

এ উজ্জীবনের প্রথম শর্ত হল ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য—মোগল-ই-আজম আমলের চেয়েও তা বেশি সংহত ও দূরপ্রসারিত। বৃটিশ তরবারি দ্বারা আরোপিত সেই ঐক্য এখন বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ দ্বারা দৃঢ়ীভূত ও স্থায়ী হবে। দেশীয় যে সৈন্যবাহিনী বৃটিশ ড্রিল-সার্জেন্টদের দ্বারা সংগঠিত ও সুশিক্ষিত হয়ে উঠেছে তা ভারতীয় আত্মমুক্তির এবং বহিরাগত যে কোনো আক্রমণকারীর শিকার হওয়া থেকে অব্যাহতির sine qua non। এশীয় সমাজে এই প্রথম প্রবর্তিত এবং হিন্দু ইউরোপীয়ের সাধারণ যুগ্ম সন্তানদের দ্বারা যা প্রধানত পরিচালিত সেই স্বাধীন সংবাদপত্র হল পুনর্নির্মাণের এক নূতন ও শক্তিশালী কারিকা। জমিদার ও রায়তোয়ারি যত ঘৃণ্যই হোক জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার দুটি বিশেষ রূপের সঙ্গে তারা জড়িত, যা হল এশীয় সমাজের মহান disideratum। কলকাতায় ইংরেজদের তত্ত্বাবধানে অনিচ্ছাভরে ও কার্পণ্য সহকারে শিক্ষিত ভারতের দেশীয় অধিবাসীদের মধ্য থেকে নতুন একটি শ্রেণী গড়ে উঠেছে যারা শাসন পরিচালনার যোগ্যতাসম্পন্ন এবং ইউরোপীয় বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত। ইউরোপের সঙ্গে ভারতের দ্রুত ও নিয়মিত যোগাযোগ এনে দিয়েছে বাষ্প, ভারতের প্রধান প্রধান বন্দরগুলিকে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব মহাসমুদ্রের বন্দরের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে এবং ভারতের অচলায়তনের যা প্রাথমিক কারণ, সেই বিচ্ছিন্ন অবস্থা থেকে তাকে পুনরুত্থিত করেছে। সেদিন দূরে নয়, যখন রেলওয়ে ও বাষ্পীয় পোতের সমন্বয়ে ভারত ও ইংলন্ডের মধ্যেকার দূরত্ব সময়ের পরিমাপে কমে আসবে আট দিনে এবং এই একদা রূপকথার দেশটা এইভাবে সত্যিকরেই পাশ্চাত্য জগতের অন্তর্ভুক্ত হবে।

ভারতের প্রগতিতে এতদিন পর্যন্ত গ্রেট বৃটেনের শাসকশ্রেণীগুলির যা স্বার্থ ছিল সেটা নিতান্ত আকস্মিক, অস্থায়ী ও ব্যতিরেকমূলক। অভিজাত শ্রেণী চেয়েছিল জয়, ধনপতিরা চেয়েছিল লুণ্ঠন এবং মিল-তন্ত্রীরা চেয়েছিল সস্তায় বেচে বাজার দখল। কিন্তু এখন তা উল্টে গেছে। মিলতন্ত্রীরা আবিষ্কার করেছে যে উৎপাদনশীল দেশরূপে ভারতের রূপান্তর তাদের কাছে একান্ত জরুরী এবং সেই জন্যে সর্বাগ্রে সেচ ও অভ্যন্তরীণ পরিবহণ-ব্যবস্থা তাকে দিতে হবে। এখন তাদের অভিপ্রায় ভারতের ওপর রেলওয়ের এক জাল বিস্তার করা। এবং সে কাজ তারা করবেই। তার ফল অপরিমেয় হতে বাধ্য।

এ কথা অতি সুবিদিত যে, ভারতের উৎপাদন-শক্তি পঙ্গু হয়ে আছে তার বিভিন্ন উৎপাদন-দ্রব্যের পরিবহন ও বিনিময় ব্যবস্থার একান্ত অভাবে। বিনিময় ব্যবস্থার অভাবের জন্যে প্রাকৃতিক প্রাচুর্যের মাঝখানে এমন সামাজিক নিঃস্বতা ভারতের চেয়ে বেশি আর কোথাও দেখা যায় না। বৃটিশ কমন্স সভার ১৮৪৮ সালে গঠিত একটি কমিটির কাছে প্রমাণিত হয়েছিল যে,

"খান্দেশে যখন এক কোয়ার্টার শস্য বিক্রি হচ্ছিল ৬ থেকে ৮ শিলিং মূল্যে তখন পুনায় তা বিক্রি হচ্ছিল ৬৪ থেকে ৭০ শিলিং দামে— সেখানে লোকে দুর্ভিক্ষে মরে পড়ে থাকছিল রাস্তায়, খান্দেশ থেকে সরবরাহ আসার কোনো সম্ভাবনা ছিল না, কেন-না কাঁচা রাস্তায় গাড়ি অচল।'

যেখানে রেলপথ-বাঁধের প্রয়োজনে মাটি দরকার সেখানে পুকুর খুঁড়ে এবং বিভিন্ন লাইন বরাবর জল সরবরাহ করে রেলওয়ের প্রবর্তনকে সহজেই কৃষি-উদ্দেশ্যের সহায়ক করে তোলা সম্ভব। এইভাবে প্রাচ্যের চাষ ব্যবস্থার যা অপরিহার্য শর্ত সেই সেচ ব্যবস্থা প্রভূত পরিমাণে বিস্তৃত করা যেতে পারে এবং জলাভাবে বারবার দেখা-দেওয়া স্থানীয় দুর্ভিক্ষগুলিকে রোধ করা সম্ভব। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রেলওয়ের অসাধারণ গুরুত্ব স্পষ্ট হবে যদি মনে রাখি এমন কি ঘাটের নিকটবর্তী জেলাগুলিতে সেচহীন জমিগুলির তুলনায় সেচদেওয়া জমিগুলির কর তিন গুন, কর্মসংস্থান দশ-বারো গুন এবং মুনাফা বারো থেকে পনেরো গুন বেশি।

রেলওয়ের ফলে সামরিক ব্যবস্থার আয়তন ও ব্যয় কমানোর উপায় হবে। ফোর্ট সেন্ট উইলিয়মের টাউন মেজর কর্নেল ওয়ারেন কমন্স সভার সিলেক্ট কমিটির নিকট বলেন ঃ

'বর্তমানে যত দিন এমন কি যত সপ্তাহ দরকার হয়, মাত্র তত ঘণ্টার মধ্যেই দেশের দূর অঞ্চল থেকে সংবাদ পেয়ে যাওয়া এবং আরো কম সময়ের মধ্যে সৈন্য ও রসদসহ নির্দেশ প্রেরণের সম্ভাব্যতা, এ বিবেচনা একটুও ছোট করে দেখা চলে না। বর্তমান অপেক্ষা আরো দূরবর্তী ও স্বাস্থ্যকর অঞ্চলগুলিতে সৈন্যদের রাখা যাবে এবং এতে করে রোগজনিত জীবনহানি বহু পরিমাণে কমানো যাবে। বিভিন্ন ডিপোতে রসদের এত বেশি প্রয়োজন থাকবে না, এবং জলবায়ুর কারণে রসদের ক্ষয়ক্ষতি ও নাশ পরিহার করা সম্ভব হবে। সৈন্যবাহিনীর কার্যকারিতা বৃদ্ধির অনুপাতে কমানো যাবে সৈন্যসংখ্যা।'

আমরা জানি, 'গ্রাম-গোষ্ঠীগুলির পৌর সংগঠন ও অর্থনৈতিক ভিত্তি ভেঙে গেছে, কিন্তু এগুলির যা সর্বমন্দ দিক—বাঁধিগৎ ও বিচ্ছিন্ন কণিকায় সমাজের বিচূর্ণীভবন, সেটার প্রাণশক্তি এখনো বজায়। গ্রামগুলির বিচ্ছিন্নতা থেকে সৃষ্টি ভারতে পথঘাটের অভাব এবং পথঘাটের অভাবের, ফলে গ্রামগুলির বিচ্ছিন্নতা হয়েছে চিরস্থায়ী। নিম্নতম মাত্রার সুযোগসুবিধার ওপর, গ্রাম গ্রামান্তরের সঙ্গে প্রায় কোনো যোগাযোগ ছাড়াই এবং সামাজিক অগ্রগতির জন্যে যা অপরিহার্য তেমন আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টা ব্যতিরেকেই এক একটি গোষ্ঠী বেঁচে এসেছে এই ছকের ওপর। গ্রামগুলির এই স্বপর্যাপ্ত জাড্য ভেঙে দিয়েছিল বৃটিশেরা, রেলপথ মেটাবে যোগাযোগ ও আদান-প্রদানের নতুন অভাববোধ। তা ছাড়া 'রেলপথ' ব্যবস্থার অন্যতম ফল হবে—রেলপথ-প্রভাবিত প্রত্যেকটি গ্রামে অন্যান্য দেশের যন্ত্রপাতি ও কারিগরির জ্ঞান, এবং সে জ্ঞান লাভের উপায় সুলভ হবে, তার ফলে প্রথমত ভারতের বংশানুক্রমিক ও বৃত্তিভোগী গ্রাম্য কারিগরের পুরো যোগ্যতার পরখ হবে এবং অতঃপর তার ত্রুটি দূরীকরণের সাহায্য হবে' (চ্যাপম্যান, 'ভারতের তুলা ও বাণিজ্য')।

আমি জানি যে ইংরেজ মিলতন্ত্রীরা ভারতকে রেলপথ বিভূষিত করতে ইচ্ছুক শুধু এই লক্ষ্য নিয়ে যাতে তাদের কলকারখানার জন্যে কম দামে তূলা ও অন্যান্য কাঁচামাল নিষ্কাশিত করা যায়। কিন্তু যে দেশটায় লোহা আর কয়লা বর্তমান সে দেশের যাত্রায় (locomotion) যদি একবার যন্ত্রের প্রবর্তন করা যায় তাহলে সে যন্ত্র তৈরির ব্যবস্থা থেকে তাকে সরিয়ে রাখা অসম্ভব। রেল চালচলের আশু ও চলতি প্রয়োজন মেটাবার জন্যে যা দরকার সে সব শিল্প ব্যবস্থা না করে বিপুল এক দেশের ওপর রেলপথের জাল-বিস্তার চালু রাখা যাবে না এবং তার মধ্য থেকেই গড়ে উঠবে শিল্পের এমন সব শাখায় যন্ত্রশিল্পের প্রয়োগ, রেলপথের সঙ্গে যার আশু সম্পর্ক নেই। তাই এই রেলপথই হবে ভারতে সত্যকার আধুনিক শিল্পের অগ্রদূত। এ যে নিশ্চয় তা আরো স্পষ্ট এই কারণে যে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ নিজেরাই স্বীকার করছে, একেবারে নূতন ধরনের শ্রম-ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া এবং যন্ত্র সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করার মতো বিশেষ যোগ্যতা হিন্দুদের আছে। কলকাতা টাঁকশালে যে দেশীয় ইঞ্জিনিয়ররা অনেক বছর ধরে বাষ্পীয় যন্ত্রে কাজ করেছেন তাঁদের সামর্থ্য ও নৈপুণ্য, হরিদ্বার কয়লা অঞ্চলে কতকগুলি বাষ্পীয় যন্ত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দেশীয়গণ এবং অন্যান্য দৃষ্টান্ত থেকে এ ঘটনার প্রভূত প্রমাণ পাওয়া যায়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কুসংস্কারে ভয়ানক প্রভাবিত হওয়া সত্ত্বেও মিঃ ক্যামবেল স্বয়ং স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, ‘ভারতের বিপুল জনগণের মধ্যে প্রভূত **শিল্প-ক্ষমতা** বর্তমান, পুঁজি সঞ্চয়ের মতো যোগ্যতা তাঁদের বেশ আছে, গাণিতিকভাবে তাঁদের মাথা পরিচ্ছন্ন এবং অঙ্ক এবং গাণিতিক বিজ্ঞানাদিতে তাঁদের প্রতিভা অতি উল্লেখযোগ্যে।’ উনি বলেছেন, ‘এঁদের মেধা চমৎকার।’ রেল ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত আধুনিক শিল্পের ফলে শ্রমের বংশানুক্রমিক যে ভাগাভাগির ওপর ভারতের জাতিভেদপ্রথার ভিত্তি, ভারতীয় প্রগতি ও ভারতীয় ক্ষমতার সেই চূড়ান্ত প্রতিবন্ধক ভেঙে পড়বে।

ইংরেজ বুর্জোয়ারা বাধ্য হয়ে যা কিছুই করুক তাতে ব্যাপক জনগণের মুক্তি অথবা তাদের সামাজিক অবস্থার বাস্তব সংশোধন ঘটবে না—এগুলি শুধু উৎপাদন-শক্তির বিকাশের ওপরেই নয়, জনগণ কর্তৃক তাদের স্বত্ব-গ্রহণের ওপরেও নির্ভরশীল। কিন্তু এ দুটি জিনিসের জন্যই বৈষয়িক পূর্বশর্ত স্থাপনের কাজ ইংরেজ বুর্জোয়ারা না করতে পারবে না। তার বেশি কি বুর্জোয়ারা কখনো কিছু করেছে? রক্ত আর কাদা, দুর্দশা ও দীনতার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিবর্গ ও জাতিকে টেনে না নিয়ে বুর্জোয়ারা কি কখনো কোনো অগ্রগতি ঘটিয়েছে?

খাস গ্রেট বৃটেনেই যতদিন না শিল্পকারখানার প্রলেতারিয়েত কর্তৃক তার বর্তমান শাসক শ্রেণী স্থানচ্যুত হচ্ছে অথবা হিন্দুরা নিজেরাই ইংরেজের জোয়াল একেবারে ঝেড়ে ফেলার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী যতদিন না হচ্ছে, ততদিন ভারতীয়দের মধ্যে বৃটিশ বুর্জোয়া কর্তৃক ছড়িয়ে দেওয়া এই সব নতুন সমাজ-উপাদানের ফল ভারতীয়রা পাবে না। যাই হোক নিঃসন্দেহে আসা করতে পারি, ন্যূনাধিক সুদূর ভবিষ্যতে দেখব এই মহান ও চিত্তাকর্ষক দেশটির পুনরুজ্জীবন, সেই দেশ যেখানকার শিষ্ট দেশবাসীরা—পিন্স সালতিকভের ভাষায়—এমন কি হীনতম শ্রেণীগুলির ক্ষেত্রেও ‘plus fins et plus adroits que les Italiens’, যাদের পরাধীনতাও এক ধরনের শান্ত মহত্ত্ব দ্বারা প্রতিতুলিত (counterbalanced). স্বাভাবিক অনীহা সত্ত্বেও যারা বৃটিশ অফিসারদের চমৎকৃত করেছে তাদের সাহস দেখিয়ে, যাদের দেশটা হল আমাদের ভাষা ও আমাদের ধর্মের উৎসভূমি, এবং যাদের জাটদের মধ্যে আমরা পাই প্রাচীন জার্মান ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রাচীন গ্রীকদের প্রতিরূপ।

উপসংহারে কিছু মন্তব্য না দিয়ে ভারত প্রসঙ্গে ছেদ টানতে পারছি না।

স্বদেশে যা ভদ্ররূপ নেয় এবং উপনিবেশে গেলেই যা নগ্ন হয়ে আত্মপ্রকাশ করে সেই বুর্জোয়া সভ্যতার প্রগাঢ় কপটতা এবং অঙ্গাঙ্গি বর্বরতা আমাদের সামনে অনাবৃত। ওরা সম্পত্তির সমর্থক, কিন্তু বাংলায়, মাদ্রাজে ও মুম্বাইয়ে যে রকম কৃষি বিপ্লব হল তেমন কৃষি বিপ্লব কি কোনো বৈপ্লবিক দল কখনো সৃষ্টি করেছে? দস্যুচূড়ামণি স্বয়ং লর্ড ক্লাইভের ভাষায় ভারতবর্ষে যখন কেবল দুর্নীতি দিয়ে লালসার তাল ধরা যাচ্ছিল না, তখন কি ওরা নৃশংস জবরদস্তির পথ নেয়নি? জাতীয় ঋণের অলঙ্ঘণীয় পবিত্রতার কথা নিয়ে ওরা যখন ইউরোপে বাগাড়ম্বর করছে তখন ভারতে কি তারা রাজাদের ডিভিডেন্ট বাজেয়াপ্ত করেনি—কোম্পানির নিজস্ব তহবিলেই যারা তাদের ব্যক্তিগত সঞ্চয় ঢেলেছিল? 'আমাদের পবিত্র ধর্ম' রক্ষার অছিলায় ওরা যখন ইউরোপে ফরাসী বিপ্লবের বিরুদ্ধে লড়ছিল তখন একই সময়ে কি তারা ভারতে খৃষ্টধর্ম প্রচার নিষিদ্ধ করে দেয়নি, এবং উড়িষ্যা ও বাংলার মন্দিরগুলিতে ধাবমান তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে টাকা তোলার জন্যে জগন্নাথের মন্দিরে অনুষ্ঠিত হত্যা ও গণিকাবৃত্তির ব্যবসায় চালায়নি? ' সম্পত্তি, শৃঙ্খলা, পরিবার ও ধর্মের' ধ্বজাধারী হল এরাই।

ইউরোপে-সদৃশ বিপুল, ১৫ কোটি একর এক ভূখণ্ডের দেশ ভারতবর্ষের প্রসঙ্গে দেখলে বৃটিশ শিল্পের বিধ্বংসী প্রতিক্রিয়া সুস্পষ্ট এবং হতভম্ব করার মতো। কিন্তু ভোলা উচিত নয়, বর্তমানে যে-ভাবে সমগ্র উৎপাদন-পদ্ধতি সংগঠিত, এ হল তারই অঙ্গাঙ্গি ফলাফল। এ উৎপাদন দাঁড়িয়ে আছে পুঁজির চূড়ান্ত প্রভুত্বের ওপর। স্বাধীন শক্তি হিসাবে পুঁজির অস্তিত্বের জন্যে পুঁজির কেন্দ্রীভবন অত্যাবশ্যক। বর্তমানে প্রতিটি সুসভ্য শহরে অর্থনীতিশাস্ত্রের যে অন্তর্নিহিত অঙ্গাঙ্গি নিয়মগুলি কাজ করছে, বিশ্বের বাজারের ওপর এ কেন্দ্রীভবনের বিধ্বংসী প্রভাব শুধু সেই নিয়মগুলিকেই উদ্ঘাটিত করছে বিপুলতম আকারে। ইতিহাসের বুর্জোয়া যুগটার দায়িত্ব নূতন জগতের বৈষয়িক ভিত্তি সৃষ্টি করা—একদিকে মানবজাতির পারস্পরিক নির্ভরতার ওপর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বময় যোগাযোগ, এবং সে যোগাযোগের উপায়; অন্যদিকে মানুষের উৎপাদন-শক্তির বিকাশ এবং প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের ওপর বৈজ্ঞানিক আধিপত্যরূপে বৈষয়িক উৎপাদনের রূপান্তর। ভূতাত্ত্বিক বিপ্লবে যেমন পৃথিবীর উপরিতল গঠিত হয়েছে, তেমনি বুর্জোয়া শিল্প ও বাণিজ্যে সৃষ্টি হচ্ছে নতুন জগতের এই সব বৈষয়িক শর্ত। বুর্জোয়া যুগের ফলাফল, বিশ্বের বাজার এবং আধুনিক উৎপাদন-শক্তিকে যখন এক মহান সামাজিক বিপ্লব কব্জা করে নেবে এবং সর্বোচ্চ প্রগতিসম্পন্ন জাতিগুলির জনগণের সাধারণ নিয়ন্ত্রণে সেগুলো টেনে আনবে, কেবল তখনই মানব-প্রগতিকে সেই বিকটাকৃতি আদিম দেবমূর্তির মতো দেখাবে না যে নিহতের মাথার খুলিতে ছাড়া সুধা পান করতে চায় না।

কালমার্কস কর্তৃক ১৮৩৫ সালের
২২শে জুলাই লিখিত
New-York Daily Iribune পত্রিকায়
১৮৫৩ সালের ৮ই আগস্ট প্রকাশিত।

সংবাদপত্রের পাঠ অনুসারে
ইংরেজি থেকে ভাষান্তর

******

মার্কস ও মার্কসবাদীদের অজ্ঞতা

লেখক - পরিচিতি

ডক্টর রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-প্রযুক্তি বিভাগের একজন কৃতী অধ্যাপক এবং কলিকাতার বিদ্যাসাগর কলেজ ও নরেন্দ্রপুরস্থ রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক মহাবিদ্যালয়ের একজন কৃতী প্রাক্তন ছাত্র। পদার্থবিদ্যার ছাত্র ও গবেষক হওয়া সত্ত্বেও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন, বিশেষ করে হিন্দুশাস্ত্র, বেদ, বেদান্ত ও উপনিষদাদির দর্শন, হিন্দু সভ্যতা এবং সংস্কৃতির প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ, পাণ্ডিত্য ও উপলব্ধি তাঁর বিভিন্ন রচনায় প্রতিফলিত হচ্ছে।